শ্রীঅরবিন্দের দিব্য কর্মযোগ

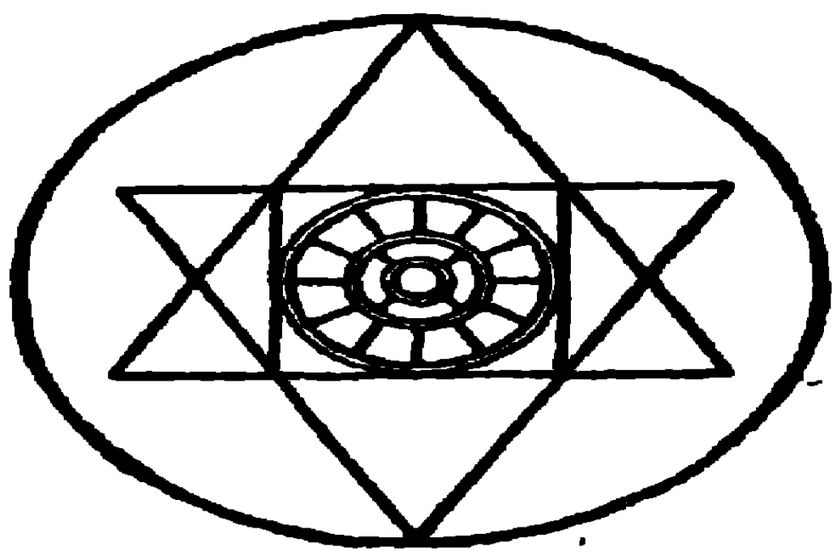

শ্রীমতী সুধা বসু

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রকাশক
শ্রীহিমাংশু কুমার নিয়োগী
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২
ফোন : ৩৪-২৩৭৬

প্রথম সংস্করণ—অক্টোবর '৫৫

মুদ্রাকর :
শ্রীসুকুমার নাগ
'ইম্প্রেশন'
৩৩বি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

Uttarpara Jaikrishna Public Library
Accn No. ৫৮৩৪ Date ২৭.৫.৭৫

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য—৫'০০ টাকা

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	জীবন ও যোগ	১
২।	প্রকৃতি পরিণামের তিনটি পর্ব	৮
৩।	পূর্ণযোগ	১৭
৪।	যোগসমন্বয়	২৬
৫।	যোগের সহায়—শাস্ত্র ও উৎসাহ	৩৯
৬।	যোগের সহায়—গুরু ও কাল	৪৬
৭।	আত্মোৎসর্গ	৬০
৮।	কর্মযোগে আত্মসমর্পণ—গীতার সাধনা	৭৪
৯।	যজ্ঞ ও যজ্ঞেশ্বর	৯১
১০।	যজ্ঞ-ভাবনার উদয়ন	১০৪
১১।	প্রজ্ঞার কর্ম ও চৈত্যপুরুষ	১১৯
১২।	প্রাণের কর্ম	১৩৮
১৩।	প্রেমের কর্ম—চৈত্যপুরুষ ও ভালবাসা	১৫৭
১৪।	যজ্ঞের উর্ধ্বায়ন	১৭৯
১৫।	সদাচার ও স্বাতন্ত্র্য	২০২
১৬।	ব্রহ্ম-সঙ্কল্প—ত্রিগুণা প্রকৃতি	২২১
১৭।	সমত্ববোধ ও অহন্তার বিলয়	২৩৭
১৮।	কর্মধ্যক্ষ	২৫২
১৯।	দিব্যকর্ম	২৬৭
২০।	অতিমানস ও রূপান্তর	২৮৪

শ্রীঅরবিন্দের দিব্য কর্মযোগ

(১)

জীবন ও যোগ

যোগের কথায় শ্রীঅরবিন্দ প্রথমেই বললেন, All life is yoga—সমস্ত জীবনটাই একটা যোগ। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখি, ঘোর আঙ্গিরস দেবকী-পুত্র কৃষ্ণকে বলছেন, 'পুরুষই যজ্ঞ। তার জীবনের প্রথম চব্বিশ বছর হল প্রাতঃসবন, তারপর চুয়াল্লিশ বছর ধরে মাধ্যন্দিন সবন এবং অবশেষে আটচল্লিশ বছর সায়ন্তন সবন। এমনি করে তার সমস্তটা জীবনই একটা সোমযাগ—বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য সমস্তই একটা অমৃত আনন্দের উচ্ছলন।' উপনিষদ বলছেন, 'একথা শুনে কৃষ্ণ অপিপাস হয়ে গেলেন।'

এখানে দুটি ভাবনার সমন্বয় দেখতে পাচ্ছি। জীবন আনন্দে উচ্ছল অথচ পুরুষ অপিপাস, অকামহত—বাসনার উত্তালতা বা অবসাদ তাঁর মধ্যে নাই। গীতাতেও দেখি এই ভাবনারই উদ্দীপ্ত প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণের সমস্তটা জীবনই ভূতভাবন একটা যজ্ঞ, তিনি উন্মেষে-নিমিষে যোগযুক্ত। অথচ তাঁর যোগ পর্বতকন্দরে নয়—কুরুক্ষেত্রে, সেখানে তিনি নিত্যজাগ্রত। এই তাঁর বহির্যোগ। আর, তাঁর অন্তরে বৃন্দাবনের স্বপ্ন—এই তাঁর অন্তর্যোগ। তাঁর কুরুক্ষেত্রের শিক্ষা আজও রূপ ধরে নি। সমস্ত জীবনই যে যোগ বা যজ্ঞ—একথা কোথাও তেমন জোর দিয়ে যেন বলা হয় নি। বিবিক্ত সাধনার শেষে জীবন্মুক্তের জীবন যোগজীবন—এ-আদর্শের সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিন্তু সাধনার শুরুতেই ব্যবহারিক জীবনও যে যোগজীবন হতে পারে—একথা একবার আমরা শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনেছিলাম, আবার তার উদাত্ত ঘোষণা শুনলাম শ্রীঅরবিন্দের মুখে।

তা-ই হয়। 'কালেন মহতা' যোগ নষ্ট হয়ে যায়, আবার সেই পুরাতনকে যুগের প্রয়োজনে নতুন করে ফিরিয়ে আনতে হয়। শ্রীঅরবিন্দের যোগজীবনের আদর্শ এবং যোগ-সমন্বয়ের ভিত্তি এই ফিরিয়ে আনার উপরে। তিনি নিজেও বলেছেন, 'আমার যোগ আনকোরা নতুন, একথা আমি বলি না। পূর্বের যোগধারার সঙ্গে তার সম্বন্ধ আছে, এবং তা থেকে অনেক-কিছুই আমি গ্রহণ করেছি। কিন্তু তাতে ফুটে উঠেছে অভিনবের একটা ব্যঞ্জনা'—যেমন আমরা দেখি গীতাতে। পূর্ণযোগের তিনটি অভিনবত্বের কথা তিনি নিজেই বলেছেন। প্রথমতঃ, এ-যোগে শুধু উপরে উঠে যাওয়াই নয়, সেখান থেকে সমৃদ্ধ হয়ে আবার নীচে নেমে এসে জীবনকে সমৃদ্ধ করারও একটা দায় যোগীর আছে। দ্বিতীয়ত, ঠিক এই কারণেই এ-যোগ একার যোগ নয়, সবাইকে নিজের সঙ্গে তুলে নিয়ে যাবার জন্য এ একটা বিশ্বযোগ। তৃতীয়ত, লক্ষ্য ও প্রকারের এই ভেদ হতে এ-যোগের রীতিতেও অনেক-কিছু নতুনত্ব থাকবে, অতীতের অনুবৃত্তি হয়েও সবটাই তার পুনরাবৃত্তি হবে না। পূর্ণযোগের এই বৈশিষ্ট্যগুলি হতে বোঝা যায়, শ্রীঅরবিন্দের সাধনপদ্ধতিতে যোগ আর জীবনে কোথাও কোনও ছেদ পড়ে নি কেন।

*　　*　　*

মাণ্ডুক্যোপনিষদে আত্মাকে বলা হয়েছে চতুষ্পাৎ—জাগরিতস্থান স্বপ্নস্থান ও সুষুপ্তিস্থান পুরুষরূপে তাঁর তিন পাদ, আর চতুর্থপাদে তিনি প্রপঞ্চোপশম, শান্ত শিব এবং অদ্বৈত। সাধারণ জীবনে আমরা দিনের বেলায় জেগে থাকি আর রাতে ঘুমাই। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি, আবার সুষুপ্তিতে স্বপ্নশূন্য গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ি। তারপর আবার জেগে উঠতে হয়, ঘুম ভেঙে যায়। এই জাগ্রত চৈতন্যকেই সাধারণতঃ আমরা জীবন বলে বুঝে নিয়েছি। অবশ্য স্বপ্নেও এর ছায়া পড়ে, কিন্তু সুষুপ্তির স্মৃতি আমাদের থাকে না—এক প্রাণারাম সুখানুভব ছাড়া। তাইতে বুঝি যে, ঘুম আর জাগরণ তখনও একই

নিরোধের অভ্যাসদ্বারা সর্বনিরোধ নির্বীজ সমাধি লাভ ক'রে সেখানেই থেকে যাবার দিকে আমাদের একটা ঝোঁক আসে।

কিন্তু, এতে সমাধি ও ব্যুত্থানে এক বিরোধের সৃষ্টি হয়। বাইরের জগৎ ছেড়ে চলে যাওয়া কাম্য হয়ে ওঠে, বাইরের ঝামেলা থেকে বরাবর দূরে থাকার চেষ্টাই প্রবলতর হয়। যোগের এই ধারা সাংখ্যসম্মত। সাংখ্যের মতে যোগের লক্ষ্য আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি ঘটানো। কথাটা ঠিক, কিন্তু গীতা আরও গভীর সমন্বয়ী দৃষ্টি নিয়ে বললেন, 'সমত্বই যোগ'। দুঃখনিরোধের আদর্শ তো আছেই, কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হ'ল—দুঃখ ও সুখকে সমানভাবে গ্রহণ করা। সমাধি ও ব্যুত্থানে সমতা আনতে হবে। সমাধিতে প্রপঞ্চের উপশমের ফলে যে অদ্বৈতবোধনিবিড় শান্তি, তার প্রসাদ নামিয়ে আনতে হবে জাগ্রতে। স্থিতধী বা জাগ্রতেও সমাধিস্থ পুরুষের প্রধান লক্ষণ হল সমতা। অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? তিনি কি বলেন, কি ভাবে থাকেন, কি ভাবে বিচরণ করেন?' এটা এমন একধরনের প্রশ্ন, যা প্রচলিত সমাধির লক্ষণের সঙ্গে মেলে না। সমাধির পরিপাক হলে অন্তর্মুখীনতার চরমে আসে এক প্রশমের অবস্থা, তাকে বলা হয় ব্রহ্মনির্বাণ। কিন্তু তাকে অন্তরে রেখে সেই আত্মশক্তির প্রসাদেই বিচরণ করতে হবে বাইরেও। তার লক্ষণ দিতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥

—ইন্দ্রিয় হবে রাগদ্বেষ হতে বিযুক্ত এবং আত্মার বশীভূত। এই ইন্দ্রিয় নিয়ে পুরুষ আত্মার শাসন মেনে যদি বিষয়ে বিচরণ করেন তাহলে তিনি অধিগত করেন প্রসাদ বা প্রসন্নতা।

এইভাবেই স্থিতধী পুরুষ সহজ হয়ে যান। বাসনা-কামনার উত্তালতায় তিনি অচলপ্রতিষ্ঠ, অকামহত। ইন্দ্রিয়গুলি আত্মবশ তাই তারা আত্মার

মুক্তি ঘটে পরা প্রকৃতিতে, যা জীবভূতা সনাতনী—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় Psychic Being বা চৈত্যসত্তা। জীবের এই চৈত্যসত্তা স্বভাবতই পুরুষে প্রপন্না এবং যোগযুক্তা। আমাদের মধ্যে তিনিই সাধনা করে চলেছেন। কাজেই দেখতে পাচ্ছি, প্রকৃতির একদিকেই যত বিড়ম্বনা। অন্যদিকে, এই অষ্টধা প্রকৃতির মধ্যেই "শুদ্ধ আমি"র বিকাশ হচ্ছে, পরম-পুরুষের সঙ্গে যার মধুর সম্পর্ক। এইখানে সাংখ্যের জ্ঞানের সঙ্গে মেলে গীতার ভক্তি। ভক্তিপথের সাধকেরা জীবনকে পুরাপুরিই স্বীকার করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে ভগবানের সংস্পর্শে জীবন দিব্য হয়ে ওঠে। সেখানেও জীবন ও যোগ যে একাত্মক—এই ভাবনার আমরা উদ্দেশ পাই।

একদিকে যেমন ব্যবহারে সমত্ব আশ্রয়ের ফলে অপরা প্রকৃতি থেকে সাধকের মুক্তি ঘটবে, তেমনি তার সঙ্গে-সঙ্গেই পরা প্রকৃতির প্রপত্তি ও শরণাগতি থেকে জীবনে আসবে রসের জোগান—এটাই শ্রীঅরবিন্দের আত্ম-সমর্পণ যোগের (Self-surrender) মূল কথা। এ-জীবন তাঁরই, তাঁতেই উৎসৃষ্ট—এ-ভাবে সমর্পিত হয়ে চলা শুরু হয় পরাপ্রকৃতি উদ্বুদ্ধ হলে; তাইতে অপরা প্রকৃতিও পরিশুদ্ধ হয়। সাধকের আধারে তখন ঝলকে-ঝলকে যোগ-মায়ারূপিনী তাঁর স্বীয়া বা পরমা প্রকৃতির শক্তিপাত হতে থাকবে। এটাই যোগসিদ্ধি। পরমার আবেশ, পরার উন্মেষ আর অপরার রূপান্তর—এই তিনের সমন্বয়ে আরুরুক্ষু যোগী পুরুষ ক্রমে যোগের পরম ভূমিতে আরূঢ় হন।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, সাংখ্যের বিবেক দিয়ে অপরা প্রকৃতিকে প্রথম প্রত্যাখ্যান করতেই হবে। কিন্তু পরে পরা ও পরমার শক্তিতে তার রূপান্তর ঘটে যায়। তখন একে বলতে পারি সর্বাঙ্গীণ যোগ। এই যোগে পুরুষ প্রকৃতি থেকে বিযুক্ত নন—বরং তার সঙ্গে নিত্যযুক্ত। পুরুষ-প্রকৃতির এই যুগনদ্ধতাই তন্ত্রে শিব-শক্তির সামরস্য। তাকে লাভ করা পূর্ণযোগের প্রাথমিক লক্ষ্য। তার পরিপাকে সমস্ত জীবনে সেই শিব-শক্তির অদ্বৈতবোধনিবিড় সামর্থ্যের

প্রকাশ ঘটবে। তখন জীবনে আর যোগে, প্রকৃতিতে আর পুরুষে কোনও ভেদ বা বিরোধ থাকবে না। তখনই আমরা বলতে পারব All life is yoga.

* * *

সমস্ত জীবনই যে যোগ—এ শুধু আরুরুক্ষু যোগীর পক্ষেই নয়, সর্বসাধারণের পক্ষেও সত্য। বস্তুত যোগের মূলে রয়েছে স্বোত্তরণের (self-exceeding) একটা প্রবেগ। এই প্রবেগ আছে জীবনেরও মূলে। বৃহৎ হবার এক দুর্বার আকৃতি সবার মধ্যেই আছে। বাইরে তার সার্থকতায় আমরা পাই অভ্যুদয়ের আদর্শ কিন্তু তাই জীবনের সবখানি নয়। আমরা যথার্থ বৃহৎ হতে পারি অন্তরেই। তাই নিঃশ্রেয়স, তা-ই পরম পুরুষার্থ। এই নিঃশ্রেয়সের রূপ হল আত্মচৈতন্যের ব্রহ্মচৈতন্যে বিস্ফারণ। বৈদিক ঋষি বলেছিলেন, 'আমার মধ্যে যে অগ্নি তাপ রূপে রয়েছেন, তাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে জ্যোতিরূপে; এবং সেই জ্যোতি এক হয়ে যাবে দ্যুলোকের অগ্নি আদিত্যের সঙ্গে। তখন যোঽসাব্‌সৌ পুরুষঃ সোঽহস্মি।' আমার এই বৃহৎ হওয়াই আত্মার ব্রহ্ম হওয়া। আদিত্যের আলো, বৃহতের আবেশ—এ যদি সহজ হয়েই পাওয়া যায়, তাহলে নিরোধের কথা ওঠে না। নিরোধের ফলে যে-আত্মপ্রতিষ্ঠা, তা আবেশের দ্বারাই সিদ্ধ হতে পারে।

কিন্তু যোগজীবনে নিরোধেরও একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। অবশ্য নিরোধ, সেক্ষেত্রে লক্ষ্য নয়, সাধনাঙ্গ মাত্র। বাইরের আকাশে সহজ আনন্দে নিজেকে ছড়িয়ে দিলাম, এই হল সাধনার একটা দিক। আবার সেই আকাশকে গুটিয়ে আনলাম হৃদয়ের আকাশে, এও সাধনার আরেকটা দিক। এই হল নিরোধের বা গুহাহিত হবার রীতি। যোগজীবনে একেও একটা স্থান দিতে হবে। অহোরাত্রের মধ্যে একটা সময় এবং সংবৎসরেরও কিছুটা সময় একেবারে সবকিছু থেকে বিবিক্ত হয়ে নিজের মধ্যে

আত্মসচেতনতা। একে অপরার বিপাক হতে মুক্ত করে পরমার আবেশে উজ্জ্বল রাখতে হবে। তা-ই ব্যষ্টিজীবনের পুরুষার্থ।

ক্রমশ আত্মসচেতনতাকে বাড়িয়ে তোলা যদি যোগের প্রধান লক্ষণ বলে ধরি, তাহলে দেখতে পাব, সমষ্টি প্রকৃতিতেও একটা যোগের ক্রিয়া চলছে। জড়প্রকৃতিতে প্রাণ ও চেতনার উন্মেষ হল প্রকৃতিপরিণামের তাৎপর্য। জড়ের অন্ধ-তমিস্রায় প্রাণ ও চেতনা সুপ্ত রয়েছে। এই অবস্থাকে বেদের ভাষায় বলা যায় 'নির্ঋতি' অর্থাৎ যেখানে আপাতদৃষ্টিতে ঋতচ্ছন্দের কোন নিশানাই নেই। আধুনিক বিজ্ঞানে এটাকেই বলে running down of matter—যার ফলে জড়ের মধ্যে এলোমেলো ভাবটা বেড়েই চলে। কিন্তু Schrödinger দেখিয়েছেন, এরই সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণের ক্রিয়া একটা ঋতচ্ছন্দ সৃষ্টি করে চলেছে। তাকে বলা যেতে পারে runing up of matter এমনি করে জড়কে উপাদান ও প্রাণকে নিমিত্ত করে ঋতায়নী প্রকৃতির একটা ছন্দোলীলা নেপথ্যে চলছেই। এমন কি এও দেখা যায়, অণুপরমাণুও সৌরজগতের ছাঁদে গড়া। এই ছাঁদ ঋতেরই অভিব্যক্তি। সুতরাং প্রকৃতির সর্বত্র নির্ঋতিকে ঋতে আনার প্রয়াসে চলছে একটা সংহনন (organisation)-সৃষ্টির তপস্যা। এও এক দুর্লক্ষ্য প্রাণ ও চেতনার ক্রিয়া।

এমনি করে প্রকৃতিতে দেখা দিচ্ছে জড় অণু-পরমাণুর লীলায়ন। তারপর তার মধ্যে প্রাণের উন্মেষ এবং চেতনার বিকাশে সবার শেষে মানবের আবির্ভাব, মনোধর্ম যার বৈশিষ্ট্য। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিপরিণামের এই তিনটি পর্বকে যথাক্রমে দেহ, প্রাণ ও মন সংজ্ঞা দেওয়া যায়। প্রাণ ও চেতনাকে আমরা একই ধর্মের ওপিঠ-ওপিঠ মনে করি—কেননা যেখানে প্রাণ আছে সেখানেই চেতনা আছে, যেখানে চেতনা আছে সেখানে প্রাণও আছে। তবে কিনা, চেতনার প্রকাশের তারতম্য আছে। সর্বত্র প্রাণময় হলেও উদ্ভিদে চেতনা আচ্ছন্ন, পশুতে অস্পষ্ট, মানুষে স্পষ্ট। এই তারতম্যের

দ্রষ্টাকে দেখা হল অনুব্যবসায়। তখন বাইরের জগৎদর্শন পরাবর্তিত হয় আত্মদর্শনে। এবং তাইতে অন্তরাবৃত্তি ও আত্মসচেতনায় যোগভূমির শুরু।

উপনিষদে এই ভূমিকে বিজ্ঞানভূমি বলা হয়। দেহ, প্রাণ ও মনের পরে এই বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের পর আনন্দ। এর মধ্যে প্রথম তিনটি ভূমি প্রাকৃত ও পরের দুটি ভূমি যথার্থ যোগভূমি। পাশ্চাত্য নবসমাজ গঠনের চেষ্টা আগের তিনটি ভূমি নিয়েই, শেষের দুটি ভূমি নিয়ে নয়। উপনিষদ-বর্ণিত বিজ্ঞানও আনন্দের সিদ্ধ রূপ এখনও আমাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু যোগের লক্ষ্যই হল বিজ্ঞান ও আনন্দকে অধিগত করে তাদের আলো ও শক্তিতে জীবনকে সমৃদ্ধ করা। পতঞ্জলিও চিত্তের পাঁচটি ভূমির কথা বলেছেন—মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, তারপর একাগ্র ও নিরুদ্ধ। এর মধ্যে প্রথম তিনটি ভূমি যথাক্রমে প্রাকৃত দেহ, প্রাণ ও মনের আশ্রিত। পতঞ্জলির একাগ্র ও নিরুদ্ধ ভূমিই উপনিষদের বিজ্ঞান বা স্বপ্ন এবং আনন্দ বা সুষুপ্তির ভূমি। যোগের প্রারম্ভে এগুলিকে ভাল করে চিনে নিতে হয়। মূঢ় চিত্ত নিশ্চেষ্ট ও তামসিক, ক্ষিপ্ত চিত্ত চঞ্চল ও রাজসিক এবং বিক্ষিপ্ত চিত্ত সাত্ত্বিক হলেও তা শুদ্ধ নয়, তাতে মূঢ়তা ও ক্ষিপ্ততার মিশ্রণ আছে। তবু তাতে লক্ষ্য অনেকটা স্থির হয়ে এসেছে—যদিও যোগের প্রয়াস তখনও স্থায়ী হচ্ছে না, আত্ম-সচেতনতাও উজ্জ্বল নয়। অতএব যোগও তখন সর্বাঙ্গীণ নয়, কেননা তখন পর্যন্ত একাগ্রতার আলম্বন অনেকটা বাইরেই থেকে যাচ্ছে। চিত্ত সমাধিস্থ হতে পারে যদি নিজের গভীরে বা আত্মবোধে সমাবিষ্ট হয়। কিন্তু সমাধিস্থ থাকাই পূর্ণযোগের লক্ষ্য নয়, একথা আগেই বলা হয়েছে। একাগ্র ও নিরোধ ভূমির সমাধিজ প্রত্যয়কে আবার নামিয়ে আনতে হবে এবং সঞ্চারিত করতে হবে নীচের তিনটি ভূমিতে—মনে, প্রাণে ও দেহে। তবেই বিজ্ঞানানন্দময় পুরুষের জাগ্রত সমাধি নিয়ে সহজভাবে বিচরণ করতে কোন বাধা হবে না। এবমিতর সম্যক দৃষ্টি নিয়ে দেখলে পর বুঝতে পারব,—All life is yoga কথাটির ব্যঞ্জনা কত গভীর!

অভ্যুদয়। কিন্তু এতেও প্রগতির তো শেষ হয় না। এরও পরে মনের ওপার থেকে ডাক আসে নিঃশ্রেয়সের। অন্নদামঙ্গলের কবি দেবীকে ঈশ্বরী পাটনীর নায়ে বসিয়ে তাকে তাঁর স্বরূপ দেখিয়েও তার চাওয়াকে 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'—এর বেশী উজিয়ে নিতে পারেন নি। এই দুধে-ভাতে তুষ্ট থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রাকৃত জীবনের অপরিহার্য প্রথম পর্ব। কিন্তু মানুষ পশুই তো নয়, প্রাণের পরেও তার মন আছে, আছে বুদ্ধি। তাই নিয়ে সে চিন্তা করে, আর এগিয়ে চলতে চায়। এই প্রগতির আকাঙ্ক্ষা হতেই মনোময় জীবনের শুরু। মন উজ্জ্বল ও সমর্থ হলে অন্নগত প্রাণের পরিতর্পণেই মানুষ তুষ্ট হয় না। অজানার ডাক শুনে সে আরও এগিয়ে চলতে চায়; তার প্রাণ বলে—'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানে'। এই স্বোত্তরণের তাগিদেই অধ্যাত্মজীবনের সূচনা। আত্মবোধের গভীরে তলিয়ে সে নিজেকে বুঝতে চায় বলে জিজ্ঞাসু হয়, আর উর্ধ্বতন রহস্যের হাতছানিতে আলোর আভাস পেয়ে নিজের আত্মপরতার গণ্ডি কেটে বেরিয়ে পড়তে চায়। এই অধ্যাত্ম-পিপাসা মানুষের মধ্যে যে কবে থেকে জেগেছে, কালের হিসাবে তা নির্ণয় করা যায় না। তাই চলার পথে ভুক্ত জীবনকে পরিপাক করে করে সে কেবলই পথে ভাসে আর বলে "হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।"

এমনি করে দেখতে পাই জড়াশ্রিত জীবন আর মনোময় জীবনের সঙ্গে অধ্যাত্মজীবনের এক ওতপ্রোত সম্পর্ক। সমস্ত মানুষের মধ্যেই ধর্মবোধের একটা উন্মেষ গোড়ায় দেখা দেয়। ধর্মবোধ ও তা থেকে একটা নীতিবোধ—কোন না কোন রকমে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই থাকে। এটা তাকে মন্দির মসজিদ, গির্জা পর্যন্ত নিয়ে যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা প্রাণের একটা গতানুগতিক এবং দায়সারা গোছের ভাব হয়ে দাঁড়ায়। যেমন দেখি দ্বিজের সাবিত্রী দীক্ষাও এখন একটা সমাজগত অনুষ্ঠানমাত্র হয়ে পড়েছে। তাইতে

ধরণের ইহবিমুখীনতা আছে, এবং তা থেকেই অধ্যাত্মসাধনায় সন্ন্যাসবাদের প্রসার। সব ছেড়েই সবকে একান্ত করে পেতে হয়, একথা সত্য। কিন্তু সেই লোকোত্তরকে জীবনধর্মে অনুস্যূত করতে আবার এখানে ফিরেও আসতে হয়, তা না হলে সিদ্ধি পূর্ণ হয় না। আমাদের সাধনশাস্ত্রগুলিতে এ দিকটা যেন তত ভাল করে চিন্তা করা হয় নি। ইহ ও পরত্রকে নিয়ে অপক্ষপাতী মননের দ্বারা অখণ্ড জীবন দর্শনের একটা আদর্শ সবারই সামনে রাখা দরকার। এই অখণ্ড জীবনের নায়ক হবে মনের উর্ধ্বতন সত্য। নিম্নতত্ত্বকে থাকতে হবে লোকোত্তরের প্রশাসনে, তবেই এইখানে তার সার্থকতা—সমষ্টির কল্যাণে এবং ইহজীবনেই।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বিত্তে পূর্ণ সমস্ত পৃথিবী পেলে আমি কি অমৃত হব?' বস্তুত অমৃতপিপাসাই মানুষকে আকর্ষণ করে নিঃশ্রেয়সের দিকে। সব কিছু চাওয়া ও পাওয়ার পরিপূর্ণতাও এইখানে। মৈত্রেয়ীর প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—বিত্তের দ্বারা অমৃত লাভের আশা নেই। জীবনে যারা উপকরণ জড় করে, তাদের জীবন যেমন তোমার জীবনও তাই হবে, তুমি অমৃতা হবে না।' তাই শুনে মৈত্রেয়ীর সেই প্রসিদ্ধ উক্তি যাতে ভারতাত্মার চিরন্তন ঘোষণা শুনতে পাই—'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম?' যা দ্বারা আমি অমৃত হব না তা নিয়ে আমি কি করব? এই উদাত্ত জিজ্ঞাসা যখন জীবনকে মথিত করে ব্যাকুলভাবে বেরিয়ে আসে, তখনই উর্ধ্বলোকের অভীপ্সায় শ্রদ্ধার আবির্ভাব হয়। এটাই যথার্থ দ্বিজত্ব—যেমন দেখেছি কঠোপনিষদে নচিকেতার বেলায়। উপনিষদ বলছেন শ্রেয় ও প্রেয় দুইই মানুষের কাছে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু যিনি প্রেয় হতে শ্রেয়কে বেছে নিতে পারেন তিনিই বুদ্ধিমান ও ধীর। তিনি সম্যক আলোচনা করে দুটিকে পৃথক করে দেখতে পারেন। কিন্তু যিনি অল্পবুদ্ধি তিনি প্রেয়কেই শুধু বরণ করেন যোগক্ষেমের টানে। নচিকেতা

একেবারেই শ্রেয়কে বরণ করেছিলেন ; তাই তিনি যমের কাছে বর পেয়েও শ্রেয়কে অপিহিত করে যে প্রেয়ের সুখ, তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ' শুধু বিত্তের দ্বারা মানুষের কামনার তর্পণ হতে পারে না। এই অতৃপ্তির বোধ মানুষের মধ্যে জাগলে পর তার আচ্ছন্ন ভাব অনেকটা কেটে যায় ; উর্ধ্বলোকের এষণার যেন একটি রশ্মিপাত হয়। তখন নিজের লুব্ধতার ক্ষুদ্রতার গণ্ডির বাইরে আসার জন্য তার মন-প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বৃহতের প্রতি এই যে আকর্ষণ, এটাই অধ্যাত্মজীবনের মূল সুর। অনশ্চক্ষু না খুললে একে ঠিক বোঝা যায় না। কেননা প্রকৃতিপরিণামের নিয়মে এটা ধরা দেয় না। বস্তুত এ যেন এক আবির্ভাব—উষার আলোর মত। অভ্যুদয়কে যদি বলি প্রকৃতির ধারা, এই আবির্ভাবকে বলতে পারি পুরুষের প্রতিবোধ, যার পরিণাম হল স্বারাজ্যসিদ্ধি।

পাশ্চাত্যদেশে দু'হাজার বছর আগে খৃষ্টের অমৃতবাণী শোনা গিয়েছিল,—'My father in heaven and I are one'—তমসার পরপারে সেই যে পরমপিতা, তিনি আর আমি এক। কিন্তু তারপর এতদিনে ওদেশে আর একটি পুরুষের কণ্ঠে এ ঘোষণা শোনা গেল না। অথচ আজ ওরা সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করে সবদিকে অভ্যুদয়ের দ্বার খুলে দিয়েছে। সমস্ত পৃথিবী সে-অভ্যুদয়কে গ্রহণও করেছে। কিন্তু কোথায় সেই মহান্ত পুরুষ—নিঃশ্রেয়সকে যিনি জীবনে সত্য করে তুলবেন ? অথচ এদেশে আমরা কখনও তাঁর অভাব অনুভব করি নি। এই আমাদের মহনীয় উত্তরাধিকার ও পরম সুকৃতি। মহাপুরুষের আবির্ভাবে মহাপ্রাণের ডাক এসে আঘাত করেছে প্রাণসাগরের কূলে। তাতে অকূলের টান প্রবল হওয়ায় আমরা কূলধর্ম খুইয়েও ফেলেছি অনেক সময়। তার প্রতিক্রিয়ায় সাধারণ জীবনে অবক্ষয় এসেছে,—এখন যেমন অবস্থা। এতে অমৃতপিপাসাও আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তবুও অমৃতবীর্য সেই পরম লগ্নটি ঘুরে ফিরে দ্বারে এসে আঘাত করে—কখনও

বলতে সমস্ত nervous systemটাকে বোঝায়। অন্তর্মুখ হলে নাড়ীস্রোতের ভিতর দিয়ে চৈতন্যের তরঙ্গ অনুভূত হয়। প্রাণস্রোতের ধারাও স্বচ্ছন্দ হয়, তার সুস্পষ্ট গতিবিধিও লক্ষ্য করা যায়। বেদে ও উপনিষদে এর প্রাচীন সাধনরূপটি পাওয়া যায়। এই নাড়ীর ভিতর দিয়েই প্রাণবহ বায়ুর গতি, তাই নাড়ীর শোধন একটি প্রয়োজনীয় সাধনকর্ম। হঠযোগীরা স্থূল উপায়ে এগুলি করতেন। দেহকে দৃঢ় করতে আসন ও হাল্‌কা করতে ষট্‌কর্ম এবং প্রাণায়াম। স্থূল দেহের বিবর্তন মানুষের মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ নিলেও নাড়ীশুদ্ধি দ্বারা প্রাণমনের শক্তি অনেক বাড়িয়ে নেওয়া যায়। হঠযোগে কুম্ভকের উপরেই জোর দেওয়া হল, যার ফলে চিত্তের প্রশম ও পরিণামে জড় সমাধি আসে। জড় সমাধিতে তত্ত্বজ্ঞান আসতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য স্পষ্ট ও ধারণা উজ্জ্বল না হলে নাও আসতে পারে। যোগভাষ্যকার সাবধান করে দিয়েছেন, বিশুদ্ধ জড় সমাধি প্রায়ই হয় না। সেজন্য সমাধিটা বড় কথা নয়। রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতে এর এক সুন্দর উদাহরণ আছে। এক বাজীকরের জড় সমাধি হয়েছিল; সেটা ভেঙে গেলেই সে আবার চীৎকার করে লোক জড় করতে চাইল খেলা দেখবার জন্য। এরকম অচেতন ভাবের সমাধি বা মূঢ়তায় কোনও কাজ হয় না। আগেই বলা হয়েছে যে মূঢ় ক্ষিপ্ত এমন কি বিক্ষিপ্ত ভূমির সমাধিতে ঠিক ঠিক যোগ হয় না। আবার হঠযোগের উৎকট সাধনায় জীবন থেকে সরেও আসতে হয় অনেক সময়। প্রাচীন যোগীরা বলতেন রাজযোগে যাদের অধিকার নেই, তাঁদের জন্যই হঠযোগ। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'এটা কোরো না, তাতে দেহের উপর মন পড়ে'। কিন্তু নাড়ীতন্ত্র সম্বন্ধে সচেতন হতে একেও আমাদের প্রয়োজন মত গ্রহণ করতে হবে। কুণ্ডলিনী যোগ হঠযোগীদেরই দান। তাতে সুষুম্নার পথ স্বচ্ছন্দ হয়। মেরুদণ্ডের ভিতর সুষুম্নাকাণ্ডে নাড়ীতন্ত্রের মূল। তার মধ্যে দিয়ে প্রাণস্রোত চলে গেছে

জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম এই তিনকে যোগত্রয়ী বলে একসঙ্গে লক্ষিত করা যায়। এ তিনের সমষ্টিতে জাগ্রতের ব্যবহার; তিনটি ওতপ্রোত, আলাদা করা যায় না। জানা ও ভাবা জ্ঞানের দিক, আস্বাদন বা রস ভাবের দিক আর কর্ম ইচ্ছার দিক। যথাক্রমে thinking feeling willing, এদের না হলে মানুষের কারবার চলে না। জানা বিশুদ্ধ হলে ব্রহ্মের চিৎসত্তার সঙ্গে যোগে জ্ঞান। রস আস্বাদনে ব্রহ্মের আনন্দস্বভাবের স্ফুরণ আর কর্মে ব্রহ্মের শক্তির বিচিত্র উল্লাস। তন্ত্রে এই শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। শক্তি ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াময়ী। চিৎশক্তিকে লীলায়িত করে রূপ ধরছে তাঁর সংকল্প—যিনি জ্ঞানস্বরূপ। তন্ত্রমতে শক্তি শুধু মায়া নয়, জগৎ মিথ্যা নয়।

বৈদিক সাধনায় যোগ ছিল সমগ্রকে নিয়ে, পুরুষ বলতে ঋষিরা গোটা সচেতন মানুষকেই গ্রহণ করেছিলেন। পরে আংশিক অনুশীলনের ফলে বিশুদ্ধ চৈতন্যকেই পুরুষ আর সব কিছু প্রকৃতি, পুরুষ থেকে অবর একটা কিছু এবং সেই ভেদাত্মক মায়া থেকে মুক্তি পাবার সাধনায় ঝোঁক পড়ায় যোগপথ-গুলি যেন ইহবিমুখ হয়ে পড়েছিল। তখনই তন্ত্রসাধনায় যোগের মহাসমন্বয়ী এক আবির্ভাব। তন্ত্র সমস্ত সাধনপথগুলি হঠ, রাজ, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি আত্মসাৎ করেও পূর্ণযোগের অনুকূলে এক বিশিষ্ট যোগের সাধন-সঙ্কেতও দিয়েছেন। সেখানে জীবন ও জগৎকে প্রত্যাখ্যানের ভাব নেই। চৈতন্যকে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করছে যে বাধাগুলি, তাদের জীবন থেকে কেটে ফেলার আগে যতদূর সম্ভব শোধিত ও মার্জিত করে চেতনাকে উর্ধ্বগামী করার প্রয়াস তন্ত্রের সাধনায় আছে। যেগুলি প্রাকৃত হেয় ও সাধনের বাধারূপে উপস্থিত হয়, সেগুলির মধ্যেও শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার ব্যূহিত হয়ে আছে। বাঁধনমুক্ত হলে সেই শক্তিসমূহ সাধনের অনুকূল হলে, পরিশেষে রূপান্তরিত হবে চৈতন্যের নিজস্ব ঐ একশক্তিতেই—এটি সাধকের অনুভবে আসে।

বর্তমানে তন্ত্রকেই ভারতবর্ষের লোকাতত ধর্ম বলা যেতে পারে। মুষ্টিমেয় বৈদান্তিক ছাড়া সাধনা এখনও যেটা আছে, তন্ত্র ছাড়া তার অস্তিত্ব নেই। বেদের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের মত তন্ত্রেও জ্ঞান ও কর্মের দুটি দিকই নিপুণভাবে অনুশীলিত হয়েছিল বৈদিক ধারারই সার দোহন করে। কিন্তু তন্ত্রের সে বিশাল জ্ঞানকাণ্ডের কথাও আমরা লোকজীবনে বিস্মৃত হয়ে শুধু পদ্ধতি গ্রন্থ দিয়ে কাজ চালিয়ে যাই। শক্তিসাধনায় আবার বামাচার ইত্যাদির বিকৃতি দেখে ও রহস্য না বুঝে তন্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষিত মনে এক প্রবল বিতৃষ্ণা দেখা দিয়েছিল। অধুনা এই বিশশতকের প্রথমার্ধেই তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলনের ফলে ও পুনরুভ্যুত্থানে এক নতুন আলোর দিগন্ত খুলে গেছে। দেখা যায় সে বিশাল গম্ভীর জ্ঞানরাশি—আগম-নিগমের থৈ পাওয়া কঠিন। জ্ঞানের এত গভীর অনুশীলন বেদান্তেও হয় নি।

তন্ত্রে পঞ্চদেবতার উপাসনার বিধি এখনও প্রচলিত। পাঁচটি দেবতা হলেন শিব, বিষ্ণু, শক্তি গণপতি এবং সূর্য। তার মধ্যে সূর্যোপাসনা মূলত বৈদিক এবং তার নিষ্কর্ষ রূপ বিশ্বামিত্রের সাবিত্রমন্ত্র আজ পর্যন্ত এদেশের দ্বিজাতি মাত্রের নিত্যজপ্য স্বাধ্যায় হয়ে আছে। মনে পড়ে সুদাসের যজ্ঞসভায় বিশ্বামিত্রের ঘোষণা, "বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মাশক্তিই ভারতজনকে রক্ষা করছে।" তাঁর সে উদাত্ত ঘোষণা সত্য হয়েছে। গণপতির উপাসনা দক্ষিণদেশেই বিশেষ করে প্রচলিত। তাঁর নামে একখানি উপনিষদও পাওয়া যায়। তন্ত্রসম্মত যে কোন বাহ্যপূজার অনুষ্ঠানেও গণেশকে ঋদ্ধি ও সিদ্ধিদাতা বলে সর্বাগ্রে স্মরণ করা হয়। তিনি প্রসন্ন না হলে সাধকের অভীষ্ট ফল লাভ হয় না। বস্তুত শিব, বিষ্ণু আর শক্তির উপাসনাই সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে। এদের অবলম্বন করে এক বিরাট অধ্যাত্মশাস্ত্রেরও সৃষ্টি হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে তাঁদের স্থান খানিকটা সঙ্কুচিত হলেও ইতিহাস পুরাণের একটা বড় অংশ তাঁরা জুড়ে আছেন। তাঁদের নিয়ে দার্শনিক ভাবনাও হয়েছে সুপ্রচুর। তন্ত্রের শৈবদর্শন

নিতে পারি। বিশ্বাতীত ব্রহ্ম মন বুদ্ধির অগোচর, তখন তিনি সতেরও উর্ধ্বে অসৎ—utter transcendence ; এটিও প্রাচীন ভাবনা। আবার ব্রহ্ম নিঃশক্তিক হতে পারেন না, জগতের দিক থেকে দেখলে তিনিই শক্তিস্বরূপ, তাঁরই প্রকাশ এই জগৎ। তখন তাঁকে সগুণও বলতে পারি, নির্গুণও বলতে পারি। কাজেই তিনি সগুণ হয়েও নির্গুণ আবার নির্গুণ থেকেও সগুণ। ব্রহ্মচৈতন্যকে আমরা দ্বিধাবিভক্ত ভাবে দেখি, পুরুষের বা চৈতন্যের দিক থেকে এবং প্রকৃতি বা শক্তির দিক থেকে। দেখার জন্য দুটি মেরু স্বীকার করে নিতেই হবে। না হলে বস্তুত পুরুষপ্রকৃতি এক অবিভাজ্য তত্ত্ব। একদিকে যদি দেখি অসৎ সৎ ও চিৎ, তবে এ তিনের প্রতিষ্ঠায় পুরুষের ভাব। আবার তারই মধ্যে আনন্দের উল্লাসে শক্তির বিচিত্র প্রকাশ হচ্ছে প্রকৃতির ভাবরূপ। এগুলি আমাদের বোধে কি ভাবে প্রতিভাত হয়। অসৎএ সব হারিয়ে যায়, থৈ পাওয়া যায় না। তাকে আমরা জীবনের কোন কাজে লাগাই না। শুধু এক অস্পষ্ট বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়ার সময় যদি সচেতন থাকি। যোগসাধনায় সমাধি আসার পূর্বেও এক অসৎ বা প্রবল নাস্তির বোধ আসে। জীবনের আর একটি ভিত্তি ব্রহ্মের সদ্‌ভাব। তাকেও আমরা জীবনের কাজে লাগাই না, এর প্রকাশ শান্তিতে ও বিশ্রামে। প্রশান্তি ও বিশ্রান্তি জীবনের সঙ্গে গ্রথিত, অঙ্গীভূত। কর্ম বা গতি একটা আছে আর ধ্রুবাস্থিতি বা স্থিরতা একটা নেই, তা তো হতে পারে না। এই ভাবে সৎ ও অসৎ জীবনের পশ্চাতে বা অধিষ্ঠানে আছেই। চৈতন্যের প্রকাশ হয় তাতে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে ও বিলাসে, সেটাই জীবন—প্রাণ। তখন যে সচেতন অবস্থা সেটাকেই জাগ্রত বলে ধরা হয়। সেই অবস্থায় থেকে চিন্তা, সংবেদন, কর্ম সবই আস্বাদিত হয় জীবের মাধ্যমে। এসবই শক্তির প্রকাশ—লীলাবৈচিত্র্য ও প্রেমবৈচিত্র্য।

তাহলে ব্রহ্মকে যখন চাই, দুভাবেই চাওয়া যেতে পারে। তার প্রতিষ্ঠার দিক—ঐ সৎভাবকে আশ্রয় করে সৎসমাপত্তি বা বিশুদ্ধস্থিতি, এই হল

আর চলে না। ভক্ত বলেন তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। তাঁকে আমার মাঝে আহ্বান করি 'সর্বভাবেন'—সব ভাব সিদ্ধ করে আমার মধ্যে আবির্ভূত হও। তোমার আলোয় আমার সব কিছু আলোময় করে তোলো। আমি শুধু হৃদয় মেলে নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দেব। আমার জ্ঞান, কর্ম, ভোগ, তপস্যা সবই তুমি। এইই দেবাবিষ্ট জীবন! আমার সব দিয়ে তাঁকে চাই, তাঁরই আলোয় প্রতিনিয়ত স্নান করে করে নিত্যনবীন হয়ে উঠছি, এই ভাবের আত্মসমর্পণে জোর ধরলে প্রাণভূমিতে বোধির আবির্ভাব সক্রিয় হয়। তখন বুদ্ধি বোধির অনুগত হলে মন প্রোজ্জ্বল হয় এবং দেহবোধ পর্যন্ত সজাগ হয়ে সাড়া দেয়। যোগের পরবর্তী সব নিগূঢ় ভূমিতেও বোধির কাজ চলে সন্ধানী এক আলো ফেলে ফেলে শিকারী সারমেয়ের ক্ষিপ্র গতিতে অনুসন্ধানের মত। তাতে ভাবসমাধি, নির্বীজ সমাধি ইত্যাদি অপ্রাকৃত আবরণগুলিও নিরাকৃত হয় এবং যোগ-সাধনার মূলতত্ত্বে যোগী সহজে পৌঁছে যেতে পারেন।

সব চেয়ে বড় কথা যোগেশ্বরের কাছে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দেওয়া। সে দেওয়াও তো তিলে তিলে বেড়ে চলে। বৈদিক ঋষিরা যেমন সৌরালোকে অভিষিক্ত হয়ে ওঠার এক চিন্ময় প্রত্যক্ষ সাধনা দেখিয়ে গেছেন, সেই বৃহতের ও সমগ্রের সহজবোধও সমর্পিত হয়ে চলার ফল। এই বোধ বা বোধিকে সম্যক লাভ করতে পারলে আত্মসচেতনতাও স্বস্থ থাকে। শুধু বুদ্ধির কারবারে মন পঙ্গু হয়ে পড়ে যদি না তাতে বোধির আলো এসে পড়ে। পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করতে এগিয়ে যায়, মূক হতে চায় বাচাল আর অন্ধের দৃষ্টিশক্তি লাভের আশ্বাস সবই এই বোধির জাগরণে সম্ভব হয়। দেবতার এই সাক্ষাৎ বোধকে আশ্রয় করে চলা পূর্ণযোগের আদর্শ।

দেখতে পেলাম ব্যাকুলতারও তিন রকমের অবস্থা। প্রথম একটা আনচান ভাব। তাতে যদি জোর না ধরে সেটা তামসিক। তারপর এক ছটফটানির ভাব আসে, সে চঞ্চলতা রাজসিক। এই দুই অবস্থার মিশ্রণ বহুদিন ধরে চলে। শাস্ত্র ও গুরু লাভ করে এই ব্যাকুলতা যেমন অনুকূলে যেতে পারে, তেমনি আবার ক্ষুদ্র অহংএর স্ফীতিতে প্রতিকূল হয়ে সাধন সম্পদ নষ্টও করে দিতে পারে। তৃতীয় অবস্থাকে সাত্ত্বিক ব্যাকুলতা বলতে পারি যখন আভাসে তাঁকে পাবার ধারণা দৃঢ় হয়। রজ ও তম গুণ অভিভূত হয়ে ব্যাকুলতার রূপান্তর হয় তখন ওই সংবেগে; সেটাই সত্যকার aspiration বা উৎসাহ। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন Psychic aspiration। চৈত্যসত্তার (Psychic Being) সিদ্ধ দৃষ্টি আছে, পরমের সঙ্গে আছে তার নিবিড় যোগ। প্রকৃতিতে প্রবল সংবেগ নিয়ে যে উর্ধ্বতন অভীপ্সা (aspiration), সেটা চৈত্যসত্তার (Psychic Being) ধর্ম। এইখানে তাকে পাবই এই দৃঢ় বিশ্বাস তার। তাই নিমেষে নিমেষে ওই যে পেয়ে হারাণো আর অন্তর মথিত করে বিরহের আকুল রোদন এই তার ব্যাকুলতা। তাঁকে ভাল না বেসেও পারি না, এমনই তাঁর প্রচণ্ড আকর্ষণ। তিনি কতভাবেই আসেন, ডাকেন—ধরেও তাঁকে ধরতে পারি না। চৈত্যপুরুষকে আধারে জাগানো শ্রীঅরবিন্দ-যোগের বড় কথা। চৈত্তসত্ত্ব জাগলে ব্যাকুলতা তখন পরিবর্তিত হবে তীব্র সংবেগে।

এইবার শাস্ত্রের কথা। শাস্ত্র হল সনাতন সেই সর্বশ্রুতিশিরোরত্ন বেদ যা প্রতিটি জীবের বুদ্ধিরূপ গুহায় গুহাহিত হয়ে আছে। সাধকের অন্তরে হৃৎকমলের দল যেন নিমীলিত। পূর্ণযোগের যোগসাধন শুরু হলে ওই কমলদল বোধির আলোয় ধীরে ধীরে যেন উন্মীলিত হতে থাকে। আর হার্দজ্যোতির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ওই সরোজকর্ণিকার অভ্যন্তরে সুপ্ত বেদজ্ঞান প্রতিভাত হয় সাধকের চিদাকাশে সূর্যোদয়ের মতই। সেজন্য শাস্ত্র কখনও সাধনা-বিচ্ছিন্ন হয় না। পূর্বেকার সিদ্ধ গুরুবর্গের সাধনার বাণীরূপের ধারক ও বাহক হল

সাধক মুক্তচিত্ত হতে পারে। কেন না বহু শাস্ত্র আছে। তা থেকে রুচি ও প্রয়োজনমত বেছে ও বুঝে নিতে হবে। শাস্ত্র সম্বন্ধে পাটোয়ারী বুদ্ধি পেয়ে বসলেই সব গোলমাল হয়ে যায়। গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতায় আটকে গেলে শাস্ত্রীয় অনুশাসনও একটা ভারের মত চেপে বসে। এ যে নিস্ত্রৈগুণ্যের পথে চলা। কোন বিধি নিষেধ তাতে নেই, কিন্তু তাবলে অধিকার সব সাধকের সমান নয়। সন্ন্যাস দেবার সময় যেমন আদেশ আছে 'শাস্ত্রযন্ত্রে যোজিত ছিলে, যোজনা ভেঙ্গে দিলাম। এবার মুক্ত হয়ে বিচরণ কর।'

কিন্তু এই মুক্তিরও প্রকৃত অধিকার অর্জন করতে হয়। সবার অধিকার সমান নয়। পূর্ণযোগের উত্তম অধিকারী যে খুব কম তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তম অধিকারী বোধিবৃত্তিতে আলোকিত পথের সবটাই একসঙ্গে দেখে নিতে পারেন এবং সত্যে অপ্রমত্ত থেকে নিজের মধ্যে পথের নিশানাও ঠিক মত ধরতে পারেন। মধ্যম অধিকারীও আছেন যাঁরা সব বুঝে এবং মেনে নিয়েও রুচিমত একটা সাধনপথ বেছে নেন। তাঁরা যুগপৎ সবটা দেখতে ও বুঝতে না পারলেও সবকে একসঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন। অন্য সব অধিকারীরা তাদেরও নীচে,—বিক্ষিপ্ত প্রমত্ত ও সঙ্কীর্ণদৃষ্টি। বেশীরভাগ সাধকই এই ভাব নিয়েই যোগ আরম্ভ করতে যায়। কিন্তু একদৃষ্টির ঝলকে সবটা দেখা সম্ভব না হলেও এ ব্যাপারে মনটা যেন মুক্ত থাকে। কেননা অধিকারও ক্রমশ বেড়ে যায় এও সত্য। অন্তর্মুখ হয়ে চলে চৈত্যপুরুষকে চিনে নিতে হবে, তখনই অন্দরের দ্বারগুলি খুলতে থাকবে। কোন শাস্ত্রেরই বহিরঙ্গগুলি যেন পেয়ে না বসে। আসল শাস্ত্র তো হৃদয়ের সনাতন বেদ, সে যে একান্তই প্রাণের বস্তু।

শাস্ত্রপাঠের নিশ্চিত প্রয়োজন আছে এবং সাধনার প্রথম অবস্থায় সাধকের পক্ষে সেটা প্রায় অপরিহার্য। কিন্তু এমন সময় আসে যখন সেই শাস্ত্রপাঠ মর্মে গ্রহণ করতে হয়। তারপর মরমীয়ার ভাব নিয়ে তাতে ধ্যানের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট

যোগের সহায়

৬

গুরু ও কাল

এবার গুরুর কথা। গুরু সম্বন্ধে প্রথমেই আমাদের মনে রাখা দরকার যে তিনি আমাদের মনের মানুষ। আমাদের প্রাণের মধ্যেই তাঁর আসল পরিচয়। তাই বাইরে যখন গুরু আসেন অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যেতে, তখন তাঁকে দেখি আমারই অন্তরতম নেদিষ্ট যে ভাবরূপ, তারই মহান বিগ্রহরূপে। বৈষ্ণব কবির ভাষায় তখন বলি—"হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির"। গুরুর সঙ্গে এই প্রাণের ও প্রেমের সম্পর্কটি প্রায়ই প্রথম দর্শনে ধরা পড়ে।

গুরুবাদ আমাদের দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। উপনিষৎ আমাদের যে আচার্যের কথা শুনিয়েছেন, তিনি জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। অন্তেবাসী শিষ্যের কাছে তিনি গূঢ়তম রহস্য ব্যক্ত করে দিচ্ছেন যেন এক লোকোত্তর আবেশে। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শিষ্যকে সমিৎপাণি হয়ে তাঁর কাছে যেতে হবে। গুরুশিষ্যের এই অপূর্ব মিলনটি সংঘটিত না হলে তত্ত্বজ্ঞান ঠিকভাবে স্ফুরিত হবে না। এর পরিচয় উপনিষদের বহু আখ্যানে আমরা পাই। অধ্যাত্ম-সাধনার পথে গুরু যে অপরিহার্য এই ধারণাই আমাদের মনে বদ্ধমূল।

কিন্তু আধুনিক যুগে গুরুর আবশ্যকতা নিয়ে অনেক কারণে প্রশ্নও জেগেছে। এই নিয়ে সংশয় ও দ্বিধা রবীন্দ্রনাথ নিজেই আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে তাঁকেও আমরা "গুরুদেব" বানিয়ে ছেড়েছি। 'চতুরঙ্গে' খোলাখুলিভাবেই গুরুবাদ নিয়ে অনেক বিতর্ক তিনি তুলেছেন এই বলে,—যে গুরুর নয়, দেবতার পথই মানুষকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে। অন্যত্র তিনি বলেছেন "কোথা আছ তুমি পথ না খুঁজিব কভু, শুধাব না কোন পথিকে"। এইভাবে গুরু ও ইষ্টের মধ্যে এক বিরোধ রবীন্দ্রনাথ নিজেই সৃষ্টি

এখন আমরা গুরুবাদ তর্কের দ্বারা সস্যাৎ করে দিলেও দলের গুরু, রাষ্ট্রগুরু এদের কাছে কিন্তু নতজানু হয়েই থাকি। তা থেকেই গোলামীর ভাব মনে আসে। কিন্তু ধর্মগুরুর সমীপে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা শিষ্যত্ব গোলামি নয়, এবং এতে লজ্জা বা অগৌরবের কিছু থাকতেই পারে না।

এইভাবে জগদ্‌গুরুর কাছে সবটাই সমর্পণ করে দিতে পারলে তিনি যখন আধারে আবিষ্ট হন, তখনই গুরুশক্তির ক্রিয়া শুরু হয়। তখন তিনি চৈত্যগুরু বা অন্তর্যামী। রামকৃষ্ণদেব এই অবস্থাকে লক্ষ্য করেই বলেছেন যে, 'শুদ্ধ মনই গুরু। খানিকটা সাধন করলে কেউ এসে বলে দেবে কি করতে হবে।' অন্তরে থেকে যিনি নির্দেশ দেন তিনিই জগদ্‌গুরু। তত্ত্বরূপ হল তাঁর ভাবনার স্বরূপ আর সাধকের উপলব্ধি পরম ভাবভূমি। গুরুপ্রণামের সুন্দর একটি মন্ত্রে এর পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি।

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষিভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

সদ্‌গুরু ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ। তিনি পরমসুখদ, কেবল জ্ঞানমূর্তিতে বিরাজিত। তিনি আকাশবৎ দ্বন্দ্বাতীত, নিত্য একল বিমল অচল থেকেও সকল বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীপুরুষ। সমস্ত ভাবকে ছাপিয়ে ও তার উর্ধ্বে গুণাতীত তাঁর স্বভাব। সেই তাঁকেই আমি নমস্কার করি।" এই মন্ত্রটি বিগ্রহবান মানুষীতনুধারা জগদ্‌গুরু সম্বন্ধেও প্রয়োগ করতে হয়। এইভাবে যদি মানুষগুরুর মধ্যে ঠিক ঠিক জগদ্‌গুরুকে দেখে বন্দনা করতে পারি, তবেই না গুরুকরণ সিদ্ধ হবে। উত্তম যার অধিকার তার এই পথে গুরু আর ঈশ্বরে তো কোনও ভেদ থাকে না। তার কাছে গুরুই যেমন ঈশ্বর, তেমন ঈশ্বরই গুরু স্বয়ং।

আবার যে মধ্যম অধিকারীরা ভাবকে আশ্রয় করে চলেন, তাঁদের ভাবরূপই

ওঠে। কিন্তু ভাবে ও রূপে ভারসাম্যটা সকলে ঠিক মত রাখতে পারে না। প্রাণের উত্তালতায় শুদ্ধ অশুদ্ধ দুই ভাবের সংমিশ্রণে সাধনপথের অনেকদূর পর্যন্ত একদিকে ঝোঁক পড়ে গোলমাল পাকিয়ে গেল এমনও হয়। গীতা ও ভাগবত এজন্য বারবার আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষী তনুমাশ্রিতম্—, মানবীয় তনুধারী আমাকে না জেনে যারা অবজ্ঞা করে তারা মূঢ়। তারা সর্বভূতের মহেশ্বর পরম সত্তাকে জানতে পারে না, দেখতেও পায় না।" গুরুবিগ্রহ সম্বন্ধে এটাই সার কথা। এই সর্বভূত মহেশ্বর বা ঈশ্বরের তিনটি ভাব—অব্যক্ত পরমভাব, বিশ্বাত্মক ভূতমহেশ্বর ভাব আর মানুষী তনুতে বিগ্রহভাব। কাজেই যারা মানুষী তনুটিকেই শুধু আঁকড়ে ধরে, তাদের পথ কখনও পূর্ণতায় নিয়ে যায় না। পরম পুরুষের বিগ্রহের পিছনে universal (বিশ্বাত্মক) ও transcendent (লোকত্তর)-কে জানতে হবে। গুরুতে এটি দেখে বুঝে নিতে না পারলেই দ্বৈতের সৃষ্টি হয়, দ্বিধা ও সংশয় এসে দেখা দেয়। আবার ভাগবত অপরূপ সেই পরমপুরুষের রূপ দেখিয়েও আমাদের বারবার নিয়ে গেছেন অরূপের ব্যঞ্জনায়, যেন তাঁকে আমরা কখনও না ভুলি। কিন্তু শুধু দুর্দর্শ অরূপকে নিয়ে কঠিন পথে যেন চলতে না চাই। কেননা অরূপেরই তো রূপ।

শ্রীঅরবিন্দ গুরু ও শিষ্য উভয় সম্পর্ককেই সাবধান করে দিয়ে বলছেন, পূর্ণযোগের সাধককে মন মুক্ত রাখতে হবে। গুরুগীতায় পেয়েছি—"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ—আমার ইষ্ট সবারই ইষ্ট, আমার গুরুই সবার গুরু।" একথাটা আওড়ানো সহজ। কিন্তু তারপরেই আছে, "মদাত্মা সর্বভূতাত্মা"। একথাটিরও গুরুত্ব ওইসঙ্গে না বুঝলেই সর্বনাশ। ইষ্ট বা গুরুকে অহংএর গণ্ডিতে ছোট করে পুরে রাখতে চাই ; তাও কি হয় ? আমার এই ক্ষুদ্র অহংবা কাঁচা আমির দ্বৈতবুদ্ধি গলে গিয়ে আত্মচৈতন্যে সবার মধ্যে একত্ব অনুভব করলে পর বোঝা যাবে আমার প্রভুই জগতের নাথ, আমার

গুরুই সবার গুরু। এটা গভীরের অনুভূতির বাণী, বাহিরের প্রচারের বিষয় নয়। জোর করে প্রচার করতে গেলে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ও হানাহানির সৃষ্টি হয়, সেটা তো ঈশ্বরের অভিপ্রায় হতে পারে না।

শিষ্যকে এ বিষয়ে যেমন সর্বদা সচেতন থাকতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি গুরুসম্পর্কেও কয়েকটি লক্ষণ শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন—অনুশাসন, আচরণ ও সবচেয়ে বড় কথা আবেশ বা শক্তিসঞ্চার। আচরণ ও অনুশাসন অপেক্ষাও শেষেরটি গভীর স্তরের কার্যকরী শক্তি।

গুরুর বাণীই তার অনুশাসন। কিন্তু সম্প্রদায় পরম্পরায় ওই বাণী গ্রহণ করার মত প্রস্তুত না হয়েই আমরা পেয়ে যাই। তা থেকেও অনেক বিরোধ ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। মহাপুরুষের বাণী নিয়ে আমাদের মতুয়ার বুদ্ধি সাম্প্রদায়িক গোড়ামিতে আটকে গিয়ে কত যে ঝামেলায় পড়ে তা আর বলার নয়। আসল কথা, যে ভাবেই চলি না কেন, আমাদের লক্ষ্য যে ওই বৃহৎ অসীম অনন্তের দিকে, সেটা ভুললে চলবে না। তাই অনুশাসন দিয়ে গুরুশক্তিতেই নিজেকে যখন বাঁধব মনে করি, তখন মন যেন মুক্ত থাকে, কেন না সে শক্তিও যে সমুদ্রগামী। এই প্রসঙ্গে পুষ্পদন্তের বহুপ্রচলিত শ্লোকটি স্মরণীয়—"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব। সব মানুষই নিজের রুচির বৈচিত্র্য অনুযায়ী, সরল ও বাঁকা নানা রকম পথ ধরে চলে। তবুও নদীসমূহের যেমন সমুদ্রই একমাত্র গতি, 'তুমি'ই সেই সকলের একমাত্র গন্তব্য।" এসব শাস্ত্রীয় কথা খুবই গভীর এবং বোঝেনও অনেকেই, তবুও কার্যত এটা যেন ঠিকমত সবসময় করা হয় না।

আমাদের দেশে বহু সম্প্রদায়। কিন্তু সব সম্প্রদায়ের আচার্যই প্রস্থানত্রয়ীর দার্শনিক রূপে এক ব্রহ্মের কথাই বলেছেন। যেমন শাক্ত বৈষ্ণব ও শৈব যথাক্রমে শক্তি, নারায়ণ ও শিবকেই পরমদেবতা মনে করেন। কিন্তু

সেখানেও ইষ্টদেবতা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই। ইষ্টের নানারূপ যাই থাকুক, তাকে ধরে যেতে হবে সেই একদেবে বা একতত্ত্বে—অসীম অনন্ত সমুদ্রের মতই যা অতল গভীর প্রশান্ত এক অনির্বচনীয় একরস প্রত্যয়ের বোধ। এ-বুদ্ধিযোগ গুরুর অনুশাসন থেকেই পেতে হবে।

আবার শাস্ত্রের যান্ত্রিকতায় বাঁধা না পড়তে হয়, সেদিকে বুদ্ধিকে সর্বদা জাগিয়ে রাখতে হবে। অবশ্য এও সত্য যে একটা নির্দিষ্ট শাস্ত্রবাণীকে স্বাধ্যায় করে না চললেও তো হবে না। সব কিছুর মধ্যে নাক গলাতে গেলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়। সেজন্য সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রথমে একটাকেই দৃঢ় করে ধরতে হয়। এ দেশের উদার শাস্ত্র গীতা, ভাগবত ও উপনিষৎগুলি আশ্রয় করে চললে শাশ্বত সনাতন পথের সন্ধান মেলে এবং অন্য পক্ষের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিরোধ থাকে না। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনও তাঁর গীতাভাষ্য এবং বেদউপনিষদের মন্ত্রবাণী থেকেই আরম্ভ করতে হয়। সম্প্রদায়-প্রবর্তকেরা সকলেই শ্রুতি ও গীতা অনুসরণ করে চলেছেন। তাই অতীতের সঙ্গে সংযোগ রেখে সর্বকালীন ও সর্বজনীন দর্শন আমরা শ্রীঅরবিন্দের বাণী থেকেই লাভ করব, যা আমাদের ধারণাকে সেই মূলে নিয়ে যেতে পারবে "যতঃ প্রবৃত্তি প্রসৃতা পুরাণী—" যেখান থেকে চিরন্তনী প্রবৃত্তিসমূহ প্রসৃত হয়ে আসছে। এমন করে প্রয়োজন বুঝে রুচিমত স্বাধ্যায় নির্বাচন করে তাতে নিবিষ্ট হতে পারলে চিত্তের ব্যাপ্তি ও ঔদার্য লাভ হয়। সব শাস্ত্র ও সম্প্রদায় যে মূলতঃ এক কথাই বলছেন, সেটা তখন বুঝতে পারা যায়। ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য বেড়া বাঁধার কাজে প্রথমে লেগে থাকতে হয়। কিন্তু চিত্ত মুক্ত থাকলে ফসল ফললে বেড়ার বাঁধন আপনিই খসে যায়। গুরু, ইষ্ট ও মন্ত্র তখন একাকার হয়ে যায়। সেই ইষ্টই সাক্ষাৎ জগদ্‌গুরু ঈশ্বর। এই ঈশ্বরই শিষ্যের অন্তরে আবির্ভূত, তার সকল কর্ম, জ্ঞান, সংবেদন ওই বোধেই অনুভূত। এই শক্তি ও বীর্য শিষ্য লাভ করে গুরুর অনুশাসন থেকেই।

আত্মোৎসর্গ

পূর্ণযোগের সাধন তো সহায়চতুষ্টয় নিয়ে শুরু করা গেল। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার শুনলাম নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করে দেওয়ার কথা। সেই আত্মোৎসর্গ বলতে কি বুঝব তা আলোচনা করে দেখা এখন আবশ্যক।

আত্মোৎসর্গ (Self-consecration) হল সমর্পণের দীক্ষা। এতে দুটি ভাবের সমন্বয় আছে; আত্মবলি বা ত্যাগের কথা এক্ষেত্রে যেমন আসে তেমনই তাঁর প্রসাদের অমোঘ শক্তি বা তাঁকে পাওয়ার কথাও এসে পড়ে। আমি একান্তভাবে তাঁতেই উৎসৃষ্ট, তাঁরই হয়ে গেলাম—এটা যখন হল, তখন দেখি তাঁর দিক থেকে বিচ্ছুরিত প্রসাদ আমাকে ভরিয়ে উপচে পড়ছে। এই পরম প্রাপ্তিকে স্বীকার করতেই হবে। এক কথায় এই অবস্থার পরিচয় হল দীক্ষা।

বৈদিক যুগ থেকেই দীক্ষা প্রচলিত। যজ্ঞে দীক্ষা নিতে হত। দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করে সমস্ত জীবনকালব্যাপী সেই পথ ধরে চলা, একেই বলা যায় যোগ-জীবনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। তার অর্থ হল অতীতের সব সংস্কার দহন করে এক নবজন্মে ভূমিষ্ঠ হওয়া। প্রাকৃত চেতনার শেষ পর্যন্ত রূপান্তর ঘটে দীক্ষালাভের ফলে। তাই দীক্ষা হল দ্বিজত্ব বা গোত্রান্তর। প্রাকৃত জীবন তো পশুজীবনেরই এক উন্নততর আবর্তন মাত্র। পরম সত্য থেকে উদ্ভূত হয়েও তার চলার বেগ নীচের দিকে বা একান্তভাবেই বহির্মুখ। আর যোগজীবনের দীক্ষা এই মানুষকেই এক নবজীবনের প্রবেশদ্বারে এনে উপস্থিত করে। তখন চারিদিক খুলে গিয়ে তার দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়ে যায়। এই নব-জীবনের দীক্ষায় মানুষের গোত্রান্তর হয়, প্রাকৃত জীবনে সে আর ফিরে যেতে পারে না—মেয়েরা যেমন বিবাহের ফলে স্বামীর গোত্র হয়ে যায় আর পিতার

শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কথাটি—হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে একটি মাত্র দেশলাইএর কাঠি দিয়ে কে যেন আলো জ্বেলে দিল। এই শক্তিপাত তাঁরই অনুগ্রহ শক্তি বা প্রসাদ (Grace)। দীক্ষার উৎকৃষ্ট লক্ষণ হল এই। যে তাঁকে চেয়েছে, তাকে তিনি স্বয়ং এসে বরণ করে নিলেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"।

তন্ত্রে তিন রকম দীক্ষার কথা আছে, মান্ত্রী শাক্তী ও শাম্ভবী। অনেক সময় কোন মহাপুরুষ দর্শন করে বা তাঁর কথা শুনেই খানিকটা গড্ডলিকা প্রবাহে পড়ে মান্ত্রীদীক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু শাক্তীদীক্ষা আবার এমনও হয় যে যাঁর কাছে দীক্ষিত তাঁর সঙ্গে চোখের দেখাও হল না। শুধু তাঁর কথা কানে শুনেই সমগ্র চিত্ত উদ্যত হয়ে উঠল, আর তখনই তাঁর দিক থেকে এক শুচি শুভ্র শক্তিকিরণ এসে আমাকে বিদ্ধ করে দিল। আমি তাঁর নাম শুনেই তাঁর হয়ে গেলাম। এরকম শক্তিসম্পাতকেও দীক্ষা বলা যায়। সর্বোৎকৃষ্ট দীক্ষার নাম শাম্ভবী দীক্ষা। বলা হয় যে স্বয়ং শিব গুরু হয়ে এসে দীক্ষা দেন আর সাধকের মধ্যে এক অঘটন সংঘটিত হয়, তার আমূল রূপান্তর শুরু হয়। দিগন্তব্যাপী আলোর প্লাবনে সব ভেসে গেল। দর্শন, স্পর্শ, মন্ত্র বা মহাকাব্য-শ্রবণ ইত্যাদির যে কোন একটি উপলক্ষ্য হয়ে সাধকের একেবারেই গ্রন্থিভেদ হয়ে গেল। গোত্রান্তর হতে আর সময় লাগল না। বলা বাহুল্য এরকম অধিকারীর সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প—তাঁরা নির্বাচিত হয়েই আসেন। কিন্তু মান্ত্রী শাক্তী যাই হক না কেন, তা শাম্ভবী দীক্ষার পরিণাম শেষ পর্যন্ত সাধককে নিয়ে যাবে, না হলে দীক্ষা সম্পূর্ণ হল না। উপনিষদে যেমন বলা হয়েছে "বিদ্যুতো ব্যদ্যুতৎ আ ; স্তনয়িত্নুৎ আ।" সেই রকম এই আদেশ বা দীক্ষা একেবারে বিদ্যুৎ চমকের মত চোখের নিমেষে অতিক্ষিপ্রবেগ সঞ্চারী আলোয় সবটা যেন উদ্ভাসিত করে দিয়ে গেল। বোধিদীপ্ত এই আধারে নিবদ্ধ চৈত্যগুরু তখন উন্মেষিত হতে থাকেন। এই চৈত্যগুরুর পূর্ণরূপই জগদ্গুরু।

এরকম হবে এটা জেনে নিয়ে এটাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রথমে Sulphur দিয়ে পূর্বেকার দীর্ঘকালসেবিত ঔষধের প্রতিক্রিয়া সারিয়ে নিতে হয়। তখন রোগটা খুব বেড়ে সঙ্গীন (aggravated) হতে পারে। চিকিৎসকের মতে এটা ভাল লক্ষণ, ভিতরের জমানো কোনঠাসা সব রোগের আক্রমণগুলি বেরিয়ে পড়েছে; তাদের সম্মুখ সমরে শেষ করতে হবে। এরপর high potency-র ওষুধ পড়লে রোগের মূল পর্যন্ত উপড়ে বেরিয়ে যাবে এবং তাহলেই রোগী সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করবে। ঠিক এইরকম ভাবে আত্মনিরীক্ষায় নিজের ভিতরের সব কিছু বৃত্তিকে বেরিয়ে আসতে দিতে হয়। একান্তে নির্জন স্থানে আসন করলে নিজের বহু জটিলতা ও complexগুলি সব অন্তর্মুখীনতার পথ থেকে যে এক অস্বস্তিকর অবস্থায় নিয়ে যায় এটা দেখা যায়। ভিজে কাঠে আগুন লাগালে গ্যাঁজলা বেরোতে থাকে আর ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু তখন হাল ছেড়ে দিলে চলে না। পূর্ণযোগে সব কিছুই এক সূত্রে গাঁথা, কাজেই আত্মপরিচয়ের মুখ্য ও ইতর সব বিবৃতিই চাই। আমাদের চিত্ত বহুসংস্কারে দীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠেছে। তারপরে আবার তাতে ভাবনা (thought), অনুভব, উদ্বেলতা (emotion) এবং সংকল্প বা সংবেগ (Will) এই তিনে ধস্তাধস্তি লেগে আছে। ভাবাবেগ আছে তো সংকল্পের দৃঢ়তা নেই, ভাবনা স্বচ্ছ নয়; আবার সংকল্পের দৃঢ়তা আছে কিন্তু ভাবনা ভাবাবেগে আচ্ছন্ন—এরকম ব্যাপার লেগেই আছে। তাই দেহ প্রাণ মনের সমন্বয় করে নিতে হবে, সে এক প্রধান দায়। দেহ চায় তো প্রাণ চায়না আবার প্রাণ চায় তো মন চায় না; এইসব ঘরের ঝামেলাগুলি ভাল করে চিনে নিয়ে সবটাই খুলে মেলে তাঁর কাছে ধরে দিতে হবে। সেজন্য প্রথম নিজের ঘরেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে, যত বেশী গ্লানি ও আবর্জনা বেরিয়ে আসে সেটা ভাল হওয়ার লক্ষণ বুঝে উৎসাহে ভাটা পড়তে দিতে নেই। বহুদিনের বন্ধ ধূলিমলিন একটি ঘর

শুধু সেটিকেই ধরে বসে থাকা। অন্ধ আসুরীশক্তি যজ্ঞ পণ্ড করে দিতে চায়, ভরাঘট যেন উল্টে দেয়। তাই এসময় চাই এক জোরালো ধৃতিশক্তি। বানরছানা যেমন মায়ের বুকটি জাপটে ধরে থাকে, তেমনি করে তাঁকে আত্ম-সমর্পণ করে সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই খুঁটি ধরে থাকার মত বীর্য তখনই চাই। সমস্ত জগৎব্যাপী অন্ধশক্তির প্রতিরোধকেও সিদ্ধ মহাযোগী হঠিয়ে দূর করে দিয়ে দেবতার আসন মুক্ত করেন; সেটা উচ্চস্তরের কথা। সে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের শেষ নেই। সিদ্ধযোগী যাঁরা এটা করেন তাঁরা বীর। শুদ্ধ স্ফটিকের মত স্বচ্ছ সে হৃদয়—তাকে ঘিরে বাহিরে ইষ্টগোষ্ঠীর বন্ধনী বা পুণ্য-পরিবেশ। কিন্তু তার বাহিরেই থাকে বিরাটের বাধা এবং তার সঙ্গে প্রবল শক্তি নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়। এই অন্ধতমিস্রার বাধাগুলিও অনাদি। এ সম্বন্ধে পূর্ণযোগের সাধকের ধারণা ও ভাবনা গোড়া থেকেই যথাসম্ভব স্বচ্ছ থাকা দরকার।

এর জন্য কি করতে হবে? বৌদ্ধদের যে মৈত্রীভাবনার কথা আছে, ব্রহ্ম বিহারের অঙ্গীভূত সেই মৈত্রীভাবনার সাধন করাটা এ ক্ষেত্রে এক অনুকূল ব্যবস্থা। ধ্যানে বসে চিত্ত যখন জমতে চায় না, তখন শান্ত হয়ে মৈত্রী বা সম্প্রীতির ভাবে আপ্লুত হয়ে যেতে হবে। তখন দেহবোধ পর্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে ভালবাসার এক dynamo-র মত কাজ করে, তার ধর্মই হল আলোর মত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল ভাব বিচ্ছুরিত করা। আমারই চতুর্দিকে আমাকে ভাসিয়ে ও ডুবিয়ে দিয়ে সেই প্রীতি সকলের মধ্যে বিচ্ছুরিত—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম উর্ধ্ব অধ সবদিকে ব্যাপ্ত সেই ভাব সবার মধ্যে আবার মিশে যাচ্ছে। এতে সব বিরোধ গলে যায় এবং চিত্তে নামে তাঁর করুণা বা ভগবৎপ্রসাদ। এই ভাবনা পূর্ণযোগের অঙ্গ করে নিয়ে প্রবর্ত সাধকেরা (beginner) গোড়া থেকেই সাধন করলে সুফল লাভ করেন। কেননা পূর্ণযোগ সবার যোগ, সকলের কল্যাণেই নিজের কল্যাণ। সুখ দুঃখ আরাম ক্লেশ এ সবই কারও

সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়। সমস্যা না থাকলেই চিত্ত প্রসন্ন হয়। আনন্দের কথা আমরা ঠিক বুঝি না, সুখকেই আনন্দ মনে করি। কিন্তু চিত্ত স্বভাবে স্থিত হলে যে প্রসন্নতা লাভ হয় তাতেই দুঃখ নাশ হয় আর বুদ্ধি আত্মস্বরূপে স্থিত হয়। এই আত্মতুষ্টিই ব্রহ্মের আনন্দঘনতা। এ যত বৃদ্ধি পাবে ততই ব্রাহ্মীস্থিতি সহজ হবে। ব্রহ্মের লক্ষণে বলা হয়—সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম। শ্রীঅরবিন্দ এই আনন্ত্যকে ভাল করে বুঝতে নির্দেশ দিয়েছেন। অনন্তের সঙ্গে যে কোনও সংখ্যা গুণিত করলে অনন্তই হয়। কাজেই এই শান্তি বুদ্ধির শুদ্ধি ও তজ্জনিত যে চিত্তের প্রসন্নতা এ সব অনন্তগুণিত হলে ব্রহ্মভাবে নিয়ে যাবে।

শান্ত ও প্রসন্ন থেকে বুঝে চললেই আত্মোৎসর্গের ভাব এসে পড়ে। সব দান তোমারই, আমি মাথায় তুলে নিই—এই ভাব। আত্মোপলব্ধির সঙ্গে এ ভাব এলে আত্মসমর্পণও সহজ হয়ে যায়। ধস্তাধস্তি করাটা আমাদের মধ্যে নিতান্তই কুশ্রী দিক, সেটা সম্পূর্ণভাবে বর্জন (rejection) করা চাই। প্রতি-মুহূর্তেই সেটাকে সরিয়ে শান্ত প্রসন্ন ভাবের প্রলেপে আলোর শিশুটিকেই সত্য ও সহজ হতে দিতে হয়। এই আলোর শিশুটি (Psychic being) যতই বর্ধিত হবে ততই কুশ্রী আমিটা ক্ষয়ে যাবে ও শেষে পালাবে। শ্রীঅরবিন্দ এই মিথ্যা বিকৃতির উচ্ছেদকে বলেছেন katharsis। সাধনার শুরুতে এটা হল ভিত্তি সাধনের কর্ম। এ থেকেই দীক্ষার প্রস্তুতি ও আত্মপরিচয় লাভ হয়। সচেতন থেকে মিথ্যা আমিকে অন্তরে প্রবিষ্ট হতে না দিলে সমনস্ক সদাশুচি থাকার বাধা হবে না। 'নির্মেঘ নীল আকাশের ভাবনায় স্বচ্ছ হৃদয়টি মেলে দিলে সেটা ধ্যানচিত্তের সহায়ক হয়। তখন যেমন আমি তেমন তুমি, তেমনই আবার জগৎব্যাপিনী মা। নীলাকাশে সূর্য, চন্দ্র, অগণন নক্ষত্রপুঞ্জ সব রয়েছে ; কোথাও তো ঠোকাঠুকি হচ্ছে না। সেইরকম ইষ্টভাবনায় নামরূপের পিছনে নির্নাম ও অরূপের ভাবনাকে মিলিয়ে নিতে নির্দেশ দেওয়া

আছে। নারদ সাবধান করে দিয়েছেন—অখণ্ড সচ্চিদানন্দের বোধ থেকে নামরূপ যেন কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়। আমার মা আমার ইষ্ট, যে নামই তিনি গ্রহণ করুন আর যে রূপই তিনি ধারণ করুন একমাত্র তিনিই তো সব হয়েছেন। তিনি অদ্বিতীয়া, সতী, চিন্ময়ী, আনন্দময়ী সর্বব্যাপিনী মহাশক্তি। এই রকম করে ইষ্টধ্যানে চিত্ত লাগাতে হয়। বাহিরের রূপ তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; ধ্যানের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হলে হৃদয়ে হৃদয় মেলে, মনে মন গলে যায়, ধীশক্তি প্রচোদিত হয়। তখন গুরুচিত্তের ধ্যানে সম্যক দৃষ্টি খুলে যায়, দেখা যায় দেহ প্রাণ মন সবই ওই দিব্য আনন্দময়ীর চৈত্যসত্তা থেকেই বিচ্ছুরিত। এ রকম হলে আর নামরূপের আড়ালে পরমেশ্বরী হারিয়ে যেতে পারবেন না। রাধাকৃষ্ণ, শিব, কালী সমস্ত ইষ্ট নামরূপ সম্বন্ধেই এই একই কথা। বিগ্রহ-বত্তার সার্থকতাও এইভাবে হয়।

উপনিষৎ শিখিয়েছেন—দেখ বাহিরের এই ভূতাকাশ, সেই বহিরাকাশই অন্তরের অবকাশ ভরে রেখেছে। অন্তরাকাশ আবর্তিত হয় হার্দাকাশে। নির্মেঘ নীলাকাশের স্বচ্ছ হৃদয়দ্যুতিতে সারা দুনিয়াটাই যে ছায়াতপে ভরে রেখেছে। এই কল্পরূপই তো আমি। কিন্তু এতে যখন চিড় ধরে নিজের ও বাহিরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সব ছেড়ে পালাতে চাই। মনে হয়, তা না হলে ওই স্বচ্ছ ছায়াতপ হৃদয়টি বুঝি রাখতে পারব না। কিন্তু প্রাত্যহিক তুচ্ছ অভিমানগুলিকেও সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে, তার মধ্যে থেকেই। এর কোন short cut বা made easy-এর উপায় নেই। অবাঞ্ছিত পরিণামগুলি চিনে নিয়ে প্রতিমুহূর্তেই তাদের তিরস্কৃত করতে হবে। জীবনের পথ থেকে এগুলি কাটিয়ে ওঠা খুব সহজ নয় কিন্তু যোগপথে এই সম্যক পরিবর্জনও এক মূল তত্ত্ব, এই কর্মে কুশলী হতে হবে তবেই আত্মদান সহজ হবে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—'অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু'। পুত্রদারা নিয়ে গৃহেই থাকতে হবে, কিন্তু অনভিষঙ্গ ও অনাসক্ত হতে হবে।

জারিত হওয়ার (pervasive concentration) প্রয়োজন। তবেই যোগভূমি পূর্ণ ও সমগ্র হয়। এই অখণ্ড অদ্বৈত বোধই বেদের ও উপনিষদের ধারা; শ্রীঅরবিন্দ এটা ধরিয়ে দিয়ে এর দিকে জোর দিয়েছেন। চিত্তের ভূমি (mood) লক্ষ্য করতে হয়। যেমন রাগ হলে সমগ্র চিত্তভূমি রাগে ঢেকে যায়, তা থেকে প্রতিপক্ষের অনিষ্ট চিন্তায় চিত্ত কেন্দ্রীভূত হয়। চিন্তা করা অপেক্ষা সংবেদনে ভূমির একাগ্রতা প্রদীপ্ত হয়। কাজেই সেই দিকটা পেতে হবে। অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণ হয়ে তিনিই সত্তাকে তাঁর পরম জ্যোতিতে আবিষ্ট করে রেখেছেন। রামকৃষ্ণদেবের সেই কথা—সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে মীন হয়ে সাঁতার কেটে চলার মত শুধু মন প্রাণ নয় সমগ্র দেহব্যাপী এক শান্ত উদ্দীপ্ত বোধ। এই স্মৃতিকে বহন করে চলতে হবে। দেহবোধ শিথিল করে দিয়ে প্রশান্তির অনুভব সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত হলে সেটা ক্রমশঃ আধারে সহনীয় হয়ে হয়ে চিত্তে ধ্যানে আবিষ্ট হবে। শেষ পর্যন্ত সবই তিনি —তুহুঁ তুহুঁ। এই হল সহজ পথ, যদি সহজ বলে কিছু থাকে।

সেজন্য শুদ্ধি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ। দেহ শুদ্ধি প্রথমেই চাই, তারপর প্রাণের ও মনের শুদ্ধি। ঈশ্বর সম্বন্ধে শুদ্ধ মনের চিন্তাভাবনায় (to feel god) আবেশ আসা চাই। অনেক উপদেশ শ্রবণ অপেক্ষা এই আবেশের শক্তি অনেক বেশী কার্যকরী হয় তা আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। প্রাণের ধর্মই হল অখণ্ডতার বোধে ব্যাপ্ত হওয়া। কাজেই দেহবোধ যত স্বচ্ছ হবে সর্বব্যাপী ওই প্রাণের আবেশে মন সংযুক্ত হলে তাঁর সঙ্গে যোগও সহজ হবে। আত্মোৎসর্গের ভাবনায় এই অখণ্ড সমগ্রতায় তন্ময়তা (pervasive concentration) সেজন্য প্রধান কথা। শেষ পর্যন্ত তৎ (ব্রহ্ম) ও আত্মার সমীকরণ হয়ে যায় এই শরবৎ তন্ময়তা থেকেই।

সে পথ ধরে সে পূর্ণভাবেই অগ্রসর হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মসিদ্ধির যোগে (The Yoga of Self-perfection) উন্নীত হলে পরে পরম সমন্বয় সে লাভ করবে।

গীতাতে আমরা যেমন পেয়েছি—কর্ম দিয়েই সাধারণত যোগ শুরু করা যায়। সর্ব কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে জ্ঞানে—সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"। যোগ শেষ পরিণতি ও পূর্ণতা লাভ করে ভক্তিতে। আমরা যে কোন যোগপথ আশ্রয় করি না কেন, আত্মাকে জেনে সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তা পূর্ণযোগ হবে না। সমন্বয় বোধটি গোড়া থেকেই ঘাট বেঁধে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রবর্ত সাধককে ওই যোগত্রয়ী অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, যাতে ওই সঙ্গে নিজের মূল সুরটি বুঝে নিজেকে পূর্ণ করে চলা সম্ভব হয়। এইভাবে কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি একসঙ্গে স্বভাবে মিলিয়ে নিয়ে আত্মবোধের আলোতে নিজের ঘটটি ভরে নিতে নিতে চলা আরম্ভ করলে সেটা হবে যথার্থ পূর্ণযোগের সাধনা। কিন্তু গোড়াতেই শ্রীঅরবিন্দ সে কথা না বলে প্রাচীন পথগুলির বিশ্লেষণ সমীক্ষা ও অন্বীক্ষা করে করে পূর্ণযোগের সাধন নির্মাণ করার কৌশলটি ধরাতে চেয়েছেন, যাতে মালমশলা সংগ্রহ করে সাধক তার নিজস্ব পথটি চিনে নিয়ে অগ্রসর হতে পারে। অখণ্ড পূর্ণযোগের যথার্থ অধিকারী যে খুবই কম এটা আমরা ভাল করেই বুঝতে পেরেছি। শ্রীঅরবিন্দ প্রাচীন যোগপন্থাগুলিকেও পূর্ণ করে নবীন করে তুলেছেন, তাদের প্রত্যাখ্যান করেন নি।

All life is Yoga অর্থাৎ যা জীবন তাই যোগ, এই যদি সত্য হয় তাহলে এও বলতে হয় যে যা জীবন তাই কর্ম ছাড়া যোগ হতেই পারে না। যোগের প্রসঙ্গে গোড়াতেই কর্মের কথা আসে। জীবনের আদি ও অন্ত যোগ হলে কর্ম পেয়েই বসে আর তাতে রসের যোগান

বলতে পারি মূল প্রকৃতি এবং তা হতেই ভূতসৃষ্টি। ভূতকে অপ্রায় করে যে ভাব তা চিৎপ্রকর্ষ। এই চিৎএর প্রকর্ষই হল জীবের মূল স্বরূপ বা স্বভাব যাকে অধ্যাত্ম বলা হয়েছে।

জড় থেকে চৈতন্যের অভিযানে জড়ত্বের পর উদ্ভিদের মধ্যে এসে জড়ের সুপ্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন, আবছা এক আধোজাগার অবস্থায় উন্মেষিত। মনু তাকে বলেছেন অন্তঃসংজ্ঞ অবস্থা। এর পর পশুর মধ্যে এসে সেই আচ্ছন্ন চৈতন্যশক্তিতে প্রাণের প্রবলতা বলের ভূয়ঃ প্রকাশ ক্রমে উন্মেষিত হয়েছে কিন্তু তাতে মন বা মস্তিষ্কের ছাঁচ তখনও নিরাকৃত। মানুষ জাতিতে চৈতন্যের প্রকাশে সেই মন জাগতে আরম্ভ করেছে। একটা ক্রম ধরে বিকাশের উন্মুখীনতায় জড়ের আধারেই প্রাণচৈতন্য প্রকৃষ্ট ভাবে ফলিত হয়েছে মানুষের বুদ্ধিতে। এই প্রাকৃত বুদ্ধি দিয়ে মানুষ নির্মাণ করেছে তার জীবনের বহুল উপকরণ। সভ্যতার অভ্যুদয়ে বুদ্ধির বলই শ্রেষ্ঠ বল। কিন্তু এই মানুষ অন্তরাবৃত্ত হয়ে যখন যোগী হল, তখন তার অহংকেন্দ্রে সচেতন এই মনবুদ্ধিকেই সে আর এই ভাবে উন্মীলিত হতে দেখতে ও বুঝতে পারল। এ এক ঘুম ভাঙার মতই মানবচৈতন্য প্রাকৃত দশা থেকে মুক্তি পেয়ে বিজ্ঞান ও আনন্দের সন্ধান পেল। সেই যোগের অধিকার মানুষ ব্রহ্মবোধের প্রতিবোধে সব কিছু জানবার শক্তি লাভ করেছে, যা জানতে পারলে আর অজানা কিছু থাকে না। এই ভাবে মূল রসের বা প্রেমের সন্ধান পেয়ে চেতনার নিত্য নব পরিচয় ও দিগন্ত সব যোগীর কাছে খুলে যেতে আরম্ভ করেছে। শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের এই হল যোগকর্ম। এমন করে ভূতের মধ্যে ভাবের উৎকর্ষ হয়ে চলেছে। বিশ্বসৃষ্টিতে পরম পুরুষের এই যজ্ঞকর্মে অক্ষর থেকে ক্ষরণ ও আবার সেই চিৎপ্রকর্ষের ধারা ধরে উজিয়ে স্বধামে যাওয়া—এই যোগের ক্রিয়া আপনা হতেই প্রকৃতিতে প্রসর্পিত হয়ে চলেছে তার স্বভাব অনুযায়ী।

পরম পুরুষের তাই ইচ্ছা। জড় থেকে প্রাণে ও পরে মনে যে স্বতঃস্ফূর্ত যোগক্রিয়া, তাতে মানুষের দায় ছিল না। কিন্তু মানব মনে সচেতন বোধ এসে পড়ায় তাঁর লীলাকর্মে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ও দায় মানুষের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। তার পরিণতি ও লক্ষ্যে পৌছবার পথে মানুষকেই দিব্যস্বভাবের অধিকারটি বুঝে নিতে হবে। এতে ক্রমবিকাশের পথে কালও সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে। অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক জীবের বিলুপ্তির মত এক পুনরাবৃত্তি ও মহতী বিনষ্টি হতে এই মানব জাতিকে অন্তরাবৃত্ত যোগকর্মের পথেই রক্ষা পেতে হবে। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স এ দুয়েরই যেটা কাষ্ঠা বা পরাগতি তা এই অন্তরাবৃত্ত যোগকর্মের ফলে।

অন্তর্মুখীনতা ও আত্মসচেতনতা থেকেই যোগকর্মের শুরু একথা অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যখন অন্তরে রসের যোগান পেয়ে ভাবের রাজ্য খুলে যেতে থাকে, তখন সেই রসাস্বাদনের তীব্র নেশায় কিম্বা জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোয় ক্ষেত্রের সবটা ঢাকা পড়ে তার ঝলকানিতে যোগী সাধক আর বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছা করেন না, এমন অবস্থা এসে পড়তে পারে। এ অবস্থায় জগৎ-বিমুখীনতা আসে এবং কর্ম তখন গৌণ হয়ে যায়। সেটা পূর্ণযোগীর লক্ষ্য নয়। সেজন্য গীতায় উপদেশ করা হয়েছে যোগস্থ থেকে কর্ম করে যেতে হবে। কর্ম ত্যাগ করা কোন মতেই চলবে না। এমন যে ঘোর কর্ম সম্মুখ সমর, তাকে পর্যন্ত কুরুক্ষেত্রে যোগকর্ম বলে দেখিয়ে দিয়ে যোগস্থ থেকে যুদ্ধ করতে উপদেশ করে সেই দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে অর্জুনকে নানা ভাবে সব দিয়ে ভগবান বুঝিয়ে দিয়েছেন। জ্ঞান ও প্রেম হল ভিতরের উপলব্ধির বস্তু, কর্মে সেই বস্তু উৎসারিত হয়। তাই শুধু কর্ম দেখে সাধারণ লোকে যোগীর ভাব বুঝতে পারে না। কর্ম যদি জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত তবে কেন এই ঘোর কর্ম যুদ্ধের নির্দেশ—এই বিভ্রান্তি ও প্রমাদ অর্জুনের প্রশ্নে ছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে কর্মকে জ্ঞানের সমান মর্যাদা দিয়েছেন

সুস্থ ও সমৃদ্ধ মানব সমাজ গড়ে ওঠে। অধ্যাত্মজীবনের সঙ্গে কর্মের সংঘর্ষ তখন দূর হয়।

দ্বিতীয়পর্বে লোকসংগ্রহ কর্ম, বহুজনহিতায় বৃহত্তর মানব সমাজের জন্য কল্যাণকর্ম। আলোচনা করতে গেলে প্রথমে এতে কল্যাণ রূপটিই দৃষ্টিগোচর হয়, তাতে চেতনার ব্যাপ্তি ঘটে। এ যুগেও মানবতাবাদ (Humanism), পরোপকারবাদ (Utilitarianism) এই সব আদর্শ সামনে রেখে কর্ম করার প্রেরণা দেওয়া হয়ে থাকে। স্বভাব অনুযায়ী ব্যক্তির সেই কর্তব্য কর্মের ফলে সমষ্টি মানবজাতি উপকৃত হয় এটা দেখা গেছে। সর্বভূতের হিতৈষণা জনসেবা জীবসেবা দেশসেবা জগৎসেবা ইত্যাদি সবই লোকসংগ্রহ কর্মের মধ্যে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র ও লোকমান্য তিলক গীতার ব্যাখ্যানে এ দিকটায় জোর দিয়েছেন। The greatest good of the greatest number—সর্বাপেক্ষা অধিক জনগণের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ যাতে সাধিত হয়, সেই জগৎহিতবাদই কর্মযোগের মূলে একথা তাঁরা বলতে চেয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করে এর ফলিত দিকটির সারবত্তা দেখিয়ে দিয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গী যেন আবার চরমে না যায় সেদিকে সাবধান করেছেন। কেননা জগৎ হিতের জন্য বা পরের কারণে নিঃস্বার্থ হয়ে কর্ম করছি, এ থেকে অহঙ্কার ও প্রমাদ এসে অনেক সময় আমাদের বিভ্রান্ত করে। মূলে যদি যোগস্থ হয়ে এ কর্ম করা যায় তবেই শেষ রক্ষা হয়, নয়তো শরীরযাত্রা নির্বাহ ও লোক সংগ্রহার্থে কর্ম কর্মযোগ না হয়ে ক্ষুদ্র অহংকে স্ফীত করে শুধু জৈবকর্মেই পর্যবসিত হতে পারে। অধ্যাত্মবোধ বাদ দিলে এ দুটি কর্মই শেষে ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়। প্রাকৃত মন নিয়ে যোগ হয় না। যোগে দীক্ষা চাই এবং যোগসাধনই প্রকৃত কর্ম। যোগী যখন শরীর যাত্রা নির্বাহ কর্ম ও লোক-সংগ্রহার্থে কর্ম করেন তখন তার মূল্যও বিভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে এই পরম্পরাটি সাংখ্যদৃষ্টিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কর্মের এই তৃতীয় ভূমিতেই

প্রকৃত যোগকর্ম বোঝা যায় যেখানে অকর্তা হয়ে কর্ম করতে হবে। কর্ম হয়ে যায়, তুমি দ্রষ্টা মাত্র—এইরকম ভাব। বুদ্ধদেবও বলতেন আত্মসচেতন হয়ে কর্ম করতে হবে। 'আমি'কে বাদ দিয়ে 'আমি' থেকে আলাদা হবার অভ্যাস করলে প্রকৃতিতে কাজ হয়ে যাচ্ছে এটা বুঝতে ও দেখতে পারা যাবে। এই হল সাংখ্যের বিবেক জ্ঞানের সাধন। পুরুষ দ্রষ্টা মাত্র, প্রকৃতি হতে বিবিক্ত। তখন কর্ম আর অকর্ম এক হয়ে যায়। ভাবটা এই রকম দাঁড়ায়, 'তুমিই করাও কর্ম, লোকে বলে করি আমি', নয়তো আমি কিছুই করি না অথচ আমাকে দিয়েই কর্ম করা হয়ে যায়। আমার 'আমি' তো বহুরূপী কিন্তু কেন্দ্রে একটি মাত্র যোগস্থ তার রূপ। সে কূটস্থ শান্ত সাক্ষীরূপ অকর্তা। এই বোধ ধারণায় পেতে হয়। বাহির থেকে বিচিত্র তরঙ্গমালার আঘাতে বাহিরের সব আমিগুলি টলে গেলেও ভিতরে অচল অটল সেই আসল 'অহম্'টি। এই ভাবের ধারণায় ও দেখায় অভ্যস্ত হলে তখন ভিতর হতেই শক্তি ও রস কর্মে উৎসারিত হবে এবং বাহিরের বিচলিত ভাবও আর টলাতে পারবে না। আত্মবোধ ক্রমে ক্রমে জেগে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হবে। তখন পুরুষ বিবিক্ত থেকে আত্মশক্তিতে সমৃদ্ধ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর আবার উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা। অকর্তা হয়েও কর্মের রাসটি টেনে ধরে থাকা বা অক্ষরে থেকে শক্তি বিচ্ছুরিত করা তখনই সম্ভব হয়। কর্মযোগের এই প্রতিষ্ঠার ভূমি বুঝতে স্বামী বিবেকানন্দের পওহরী বাবার দৃষ্টান্ত দেখানোর কথাটা মনে পড়ে। গুহাহিত থেকেও যোগীর পক্ষে এমন শক্তি সঞ্চার সম্ভব যে প্রতি জীবে সেই যোগশক্তির আবেশ হয়।

অকর্তার কর্ম হলে ব্যাপ্তিচৈতন্যের বোধ আসে। তখন শুধু 'আমি' নই, সমস্ত বিশ্ব কর্ম করে চলেছে এই দৃষ্টির উন্মেষ হতে থাকে। প্রকৃতিই সকলকে কর্ম করিয়ে নিয়ে চলেছে এবং তার মূলে রয়েছে এক দিব্য সংকল্প। তখনই বুঝতে পারা যাবে যে এই 'আমি' সত্যসত্যই তাঁরই মাঝে। দিব্যপুরুষের

পারিনি, এক কথায় প্রাণ দিয়ে আমরা মানুষকে ভালবাসতে পারিনি। তাই এত হানাহানি, সংঘর্ষ যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে চলেছে। জীবনের কর্মক্ষেত্রে আমরা বুদ্ধি দিয়ে মীমাংসা করে নিতে চাই কিন্তু হৃদয় থেকে সে বুদ্ধি উৎসারিত না হলে কোন সমাধান আসতে পারে না। ওদেশেও Christ-এর বাণী ছিল Love Thy neighbour তোমার পাশের লোককে ভালবাসো। হৃদয় পবিত্র না হলে কিছু তো হবে না। আর তা হলেই চৈত্য রূপান্তর সম্ভাবিত হবে। কিন্তু আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে অবিশ্বাস করি, সন্দেহ করি কিন্তু ভালবাসতে পারি না। এতে বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে, ঠাণ্ডা লড়াইএর যন্ত্রণার শেষ নেই। সমষ্টি মানবজাতির চৈত্যরূপান্তরের কথা গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে এই বিশ্বযুদ্ধ কত বড় এক সমস্যা। তাই না অতিমানস রূপান্তরের পরমা সিদ্ধির সময়টি জানতে চাইলে Mother বলেছেন "Let us work 5000 years!" পূর্ণযোগ তো একার নয়! সবার যোগে এ যে এক বিশ্বযজ্ঞ।

এখন শুধু নিজের সাধনা ও মুক্তির কথা ভাবলে তো কোন সমাধান পাওয়া যাবে না। গুহাহিত হয়ে থেকে গেলেও চলবে না, কর্মযোগে যুক্ত হতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন সব সাধকদের যে, একটা জীবন দে কর্মে তারপর ভগবানকে দিস। সাধারণ লোকে যাতে কর্মে আনন্দ পায়, রস পায়, যুক্ত হতে পারে সেজন্য বিদ্বান দূরে সরে থাকতে পারেন না; সকলের সঙ্গে কর্মযোগে তিনি যুক্ত থাকবেন—'জোষয়েৎ সর্ব কর্মাণি'। এই সমস্যাসঙ্কুল যুগে আজ আমাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। সমগ্র বিশ্ব নিয়েই আমাদের কারবার। কেউ আমরা বিচ্ছিন্ন নই। বাংলায় কবিতা লিখতে বসেও কবিকে অনেক দূরে বোমায় চূর্ণ করার দৃশ্য দেখতে হয়, লিখতেও হয়। কাজেই সমস্যা ব্যাপক ও গুরুতর।

কর্মের পঞ্চভূমি আলোচনা করে আমরা দেখলাম যে, যোগীকে সর্বব্যাপী

বিশ্বচৈতন্যে সমসাময়িক সমস্যাগুলিরও কর্মে মীমাংসা ও সমাধান পর্যন্ত দেখিয়ে দিতে হয়। সম্যক আজীবের কর্ম প্রাথমিক জীবনধারণের কর্ম মাত্র। লোক সংগ্রহার্থে বা বিশ্বহিতের উদ্দেশ্যে ঐ কর্ম ব্যাপ্তি লাভ করে, পরিণত হয়, বৃহৎ হয়। কিন্তু এই দুটি ভূমিতে কর্ম যোগীর কর্ম যেমন হতে পারে আবার প্রাকৃত ভূমিতেও তেমন কর্ম থেকে যেতে পারে। যোগীর কর্ম হলে এর পরের ভূমিকার সন্ধান পাওয়া যাবে, গীতা যাকে বলেছেন কৃৎস্নকর্ম। যথার্থ যোগী অকর্তা হয়েও কর্ম করে চলেছেন, তাই এই ভূমিকেই যোগভূমি বলা যায়। বিবিক্ত তটস্থ থেকে তাই কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম, এইভাবে সিদ্ধ হয়ে চলে। তখন দেখা যায় সমস্ত দুনিয়াই কর্ম করে চলেছে এক দিব্যসংকল্পের বাহন হয়ে, এই পৃথিবীতে সেই দিব্যসংকল্প সিদ্ধ করতে। যেমন আমি তেমন প্রতিটি জীবই এক "নিমিত্তমাত্র" হয়ে কর্ম করবে—এই নির্দেশ স্বয়ং শ্রীভগবানের। এই নিমিত্ত কর্ম পূর্ণ হবে ও পরিণতি লাভ করবে দিব্যকর্মের প্রতিষ্ঠায়। শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগের বিবৃতিতে প্রধানত গীতার মহান আদর্শ অনুসরণ করে তাতে দিব্য-ভাবনার সমাবেশ ঘটিয়ে দিব্যকর্মকে সম্ভাবিত করেছেন। ভগবানের অবতার কর্মে অংশ গ্রহণ করে দেবকর্মকে মূর্ত করে তোলার আদর্শ পরিস্ফুট হয়েছে কর্মযোগের প্রসঙ্গ শেষের দিকে শ্রীঅরবিন্দের বাণীতে। পরে এ বিষয়ে আবার বিশদ আলোচনা করা হবে। আমরা এ পর্যন্ত নিশ্চিত করে বুঝলাম যে ভগবানের অচ্যুত প্রতিষ্ঠা থেকে পূর্ণযোগের দেবকর্ম কখনই বিযুক্ত হতে পারে না। কর্তা ও কর্ম অদ্বৈত রসে সাযুজ্য লাভ করে সিদ্ধকর্ম সম্ভাবিত করে চলতে থাকেন, জ্যোতি থেকে উত্তর জ্যোতিতে তার নিত্য নবীন দিগন্তগুলি খুলে যেতে থাকে।

কর্মযোগে গীতার মহান আদর্শ দুটি মূল ভাবের উপর বিধৃত—সমত্ব ও একত্ব। ভগবানের আত্মসমর্পণ কর্মে প্রথমে একত্বের ভাবনায় যেমন জগদতীত পরমাশক্তির আবেশ, সমত্বের ভাবনায় তেমন বিশ্বব্যাপী বৃহতে পরাশক্তির

পরে ভাল ও মন্দ দু'দিকই এসেছে। যজ্ঞের অনুষ্ঠান ছাড়া আর কোন কর্মই যেন কর্মযোগে গণ্য হয় না, এমন ধারণাও এসে পড়ে এবং অনুষ্ঠানগুলি হতে থাকে ক্রিয়াবিশেষবহুল। পূজা-অর্চনাই যদি একমাত্র দেবকর্ম হয় তাহলে জীবনে ভাগাভাগি এসে যায়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন জীবনের সমস্ত কর্মই যজ্ঞ বা দেবকর্ম হতে পারে। জীবনের দেবতার উদ্দেশ্যে প্রতিটি ক্রিয়া ও কর্মানুষ্ঠান—এই হল ভাবমূল। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় একথা বলেছেন এবং তারও পূর্বে উপনিষদে, ঘোর আঙ্গিরসের মুখে শ্রীকৃষ্ণ এই উপদেশ শুনেই আপিপাস হয়ে গেলেন, এই আখ্যান আমরা শুনেছি। সমস্তজীবনই তাহলে সোমযাগ এবং পুরুষই যজ্ঞ। তাঁর জীবনের পর্বে পর্বে অমৃত আনন্দের উচ্ছলন। গীতায় অনাসক্ত যোগের মূল ভাব এই আপিপাস হওয়া। আবার জীবনের সব কর্মই যদি দেবতার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে আমার বলতে দ্বিতীয় আর কিছু থাকে না। এই ভাবে কর্মের অনুষ্ঠান করা ও কর্মযোগে সিদ্ধ হওয়া বড় কঠিন।

কিন্তু এই শাশ্বত যজ্ঞবিধিই যে জগৎসৃষ্টির মূলে, শ্রীঅরবিন্দ তা ধরিয়ে দিয়েছেন। গীতা থেকেও এই প্রাচীন ভাব ধরে যজ্ঞসহিত প্রজাসৃষ্টির ব্যাখ্যা শ্রীঅরবিন্দ বিশদভাবে করে দিয়েছেন। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে দেবতার আত্মাহুতি বা পুরুষযজ্ঞের কথা পেয়েছি। দেবতার আহুতির নাম হল বিসৃষ্টি। তন্ত্রমতে পরমশিব স্বেচ্ছায় জীবভাবের মূলে পাশবন্ধন স্বীকার করেছেন, সেটাই পুরুষযজ্ঞ। আবার এই যজ্ঞদ্বারাই পাশবদ্ধ জীব পাশমুক্ত সদাশিব হতে পারবেন। মানুষের দিক থেকে যজ্ঞপথে উজানে যাবার নাম হল উৎসর্গ বা অতিসৃষ্টি। দেবতা সৃষ্টিতে নেমে এলেন বিচিত্রভাবে, তাই সেটা হল বিসৃষ্টি। আর মানুষও সেই বিধি অনুসরণ করে নিজেকে ঢেলে দেয়, উৎসর্গ করে। তাঁকে দিলে নিজকে সম্পূর্ণভাবে ছাড়তে হবে। দেবতাই মানুষের আধারে পূর্ণভাবে বিকশিত হবেন বা যজ্ঞদ্বারা

শক্তি উৎসারিত হয়। এই হল যোগের পথ। সেজন্য তপ যোগের উপায়, সেটা নিগ্রহ নয়। আতস কাঁচের ওপর সূর্যকিরণ সংহত হয়ে যেমন প্রচণ্ড তেজে আলোক সঞ্চার করে, ঠিক তেমনি শ্রদ্ধা সহকারে একাগ্রভাবে সংযমের শক্তিতে সিদ্ধ হলে যজ্ঞে আত্মহুতিও তখন সম্ভব হয়। যোগীকে এই একাগ্রতাই নির্জনে অভ্যাস করতে হয়।

এর পরে আসে দানের কথা। সর্বভূতে যা আছে, তাই আবার তাঁকে দিতে হয়। এটা লৌকিক বুদ্ধিতে করলে হয় দান, আর তাঁরই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হলে হয় যজ্ঞ। সবার মধ্যেই তুমি আছ, তোমাকেই দিচ্ছি। আবার আমার জন্যও যে আমি গ্রহণ করি, তাও তোমারই জন্য। তাই তোমারই জন্য আমার আত্মপ্রসাধন, তোমারই জন্য আমার আত্মসংযম। প্রাচীন কালে গৃহস্থদের পঞ্চাগ্নি বা পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য ছিল। এগুলি আত্মশুদ্ধির উপায় তাই কোন না কোন ভাবে করতেই হবে। লৌকিক ভাবের স্তরে দানই যজ্ঞরূপে আরম্ভ হয়, কিন্তু নিয়ে চলে লোকোত্তর ভাবে। সকাম কর্ম থেকে নিষ্কাম কর্ম বা কর্তব্য কর্মের এই যে নির্দেশ, কর্মযোগে যজ্ঞভাবনায় এটি সম্পাদিত করতে একত্ব ও সমত্ব রেখে চলতে হবে।

কিন্তু কর্মের গতি তো গহন, কি করে জানা যাবে কর্তব্য কর্ম কি! জীবনের সামনে পরম্পরাক্রমে যা আসে তা করে যেতে হয়, তাতে সাধারণ কর্তব্য কর্ম জানা যায়। কর্মে অবিচলিত থাকা আর আঘাতে স্থির ও অটল থাকা, এসব লক্ষণ নিয়ে কর্ম করতে শুরু করলে, কর্ম ঠিকমত করে যেতে দ্বিধা ও সংশয় আসতে পারে। কতকগুলি কর্মকে কর্মযোগের শাস্ত্রবিহিত কর্ম বলেও নির্দিষ্ট করা হয়। কিন্তু তাতেও সংশয় উপস্থিত হলে পরে শাস্ত্র ও মহাজনের নির্দেশ নিতে হয়। তাকে বলে কর্মবিচিকিৎসা। এ সবই ফলাকাঙ্ক্ষা না

এভাবে পাওয়া যায় সকলের শেষে, তাই প্রথমে নিজকে বাদ দিয়ে নিজের বাহিরেই তাঁকে একভাবে পেয়ে সাধনা শুরু করতে হয়। সেটা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ও ক্ষুদ্রতার মধ্যে বৃহৎকে জুড়ে নিয়ে, শেষের লক্ষ্যকেই মূলে ভাবনায় আনতে হবে। এও গীতার কর্মকৌশল। রামকৃষ্ণদেব যেমন বলতেন "জ্ঞানীর হেথা হেথা, অজ্ঞানীর হোথা হোথা"। এটা ভক্তিরও অনুকূল। তারই মধ্যে আমি বা যা-কিছু সসীম, সে সবই। এইভাবে বৃহতের অনুভব—সেই ব্রহ্মরূপ অনন্ত সমুদ্রে মীন হয়ে বিচরণ করার মত। ব্রহ্মসমুদ্রে আমরা সকলেই ডুবে আছি। ইষ্টভাবনাতে এভাবে জারিত হতে পারলে পরাক দৃষ্টিতেও তাঁকেই দেখা যায় ও আত্মতুষ্টি হয়। এত বড় করে না ভাবতে পারলে ধর্মকর্ম প্রাণহীন অনুষ্ঠান কর্ম হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মকে বিভূতি বা শ্রী রূপে জীবনে কতটুকু দেখতে পাওয়া যায়? কালী কেমন? না 'ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন'। তিনি যে ইচ্ছাময়ী এই আকাশ-বাতাস সব তিনিই হয়ে আছেন, তিনিই প্রাণ, ব্রহ্মের প্রাণসমুদ্র—সে তো তিনিই। অহরহ এ ধরণের ইষ্ট ভাবনা থেকে সাযুজ্যবোধ আসে। এই সাযুজ্যবোধে উপাসক ইষ্টের সঙ্গে একাকার হন।

যাদের আবার আত্মভাব প্রবল থাকে, সাযুজ্যে তাদের আত্মচৈতন্যের এক বিস্ফারণ ঘটে। বেদান্তের ভাষায় সেটি হল অহংগ্রহের উপাসনা। এ বিচারের পথ। বহির্জগতের যা-কিছু সেসব আমার চৈতন্যে রূপান্তরিত না হলে যেমন কিছু বুঝি না, তেমন আমারই আত্মচৈতন্য বিরাট, স্থির ও পূর্ণ—"আপূর্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠম্"; সব ভাবরূপ তার মধ্যে পড়ে একাকার হয়ে যায়, এই দেখতে পাই। কোন তরঙ্গ আর শেষ পর্যন্ত ওঠে না। এভাবে অহংগ্রন্থিটি একেবারে খুলে গেলে, উপনিষদের ভাবে ভূমার উপাসনায় আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণ হয়।

এই দুরকম ভাবে ছাপিয়ে গিয়ে তাঁকে পরিপূর্ণরূপে পাওয়া, তার অধিকারী খুবই কম। শ্রীঅরবিন্দ যেমন দেখিয়েছেন—সর্বব্যাপী চৈতন্যে নিজকে বৃহৎ করে যেন ছড়িয়ে দিয়ে নিঃশেষ করে দিলাম। আত্মজ্যোতির বিস্ফারণে জ্বলছি, তা থেকে সত্তা মাত্র রইল মহানির্বাণরূপে। রিক্ততার এক মহাশূন্য, সব জ্যোতি মিলিয়ে যায় এক অপরূপ কালোর আলোয়। সেই আভা থেকেই সব কিছু বিভা। এ সর্বনাশা ডাক যেখানে নিয়ে যায়, সেখান থেকে ফিরে না আসার এক তীব্র আকর্ষণ আছে এবং তা থেকেই জীবন প্রত্যাখ্যানের দর্শন এসে জীবনকেও অধিকার করে। মায়াবাদ, বৈরাগ্যবাদ এই জীবন প্রত্যাখ্যানের দর্শন। কিন্তু বুদ্ধের এই পরিনির্বাণকেও পেতে হবে, তবেই শ্রীঅরবিন্দের যোগের ভিত্তি বোঝা যাবে, একথা বলা হয়েছে। নির্বাণের পর এক মহাশূন্য, কোনও বিকল্পের অধীন তা নয়। পরম রিক্ততা ও নিবিড় নীরবতা, আর সেখানেই রয়েছে মূল শক্তির উৎস। সেই মহামরণকে যদি জীবনে অনুস্যূত দেখতে শিখি, তবেই পূর্ণযোগের অধিকার পাওয়া যাবে। এই পরম শূন্যতা ও বৈরাগ্য নিয়ে সংসারে থাকাটা যে অসম্ভব বা খুব কঠিন, তা যেন মনে না করি। রবীন্দ্রনাথের জীবনে আমরা দেখেছি, তিনি মৃত্যুকে যেন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁকে মৃত্যুর ধ্যান পেয়ে বসেছিল। এও বৌদ্ধভাবনার অনুকূল ধ্যান। এই নিয়ে তিনি সংসারে থেকে গেছেন, কর্ম করে গেছেন। তাঁর কাছ থেকে সে-শিক্ষাটুকু আমরা নিতে পারি। তিনি বলেছেন তাঁর মধ্যে আছে এক বাউল, যে কখনও বাঁধা পড়ে না। সকলের মধ্যেই সেই বাউল ঘরে-ঘরে এক মহামরণরভসে ঘুরে বেড়ায়, তাকে চিনে নিতে হবে। অনাসক্ত ভালবাসা, শোক ও মোহের অধীন না হওয়া, এইভাবে নির্বাণকে নামিয়ে এনে জীবনে চলতে পারলে সংসার পর্যন্ত উজ্জ্বল ও মধুর হয়ে ওঠে।

১০

যজ্ঞ-ভাবনার উদয়ন

তাহলে কর্মযোগের প্রথম সঙ্কেত হল, কর্মকে যজ্ঞে রূপান্তরিত করা। এ একটা সাময়িক অনুষ্ঠান মাত্র নয়। যজ্ঞভাবনায় প্রতিষ্ঠিত থেকে সমস্ত জীবনব্যাপী সর্বপ্রকার কর্মানুষ্ঠান সম্পাদিত করতে হবে, গীতাতে এরকম নির্দেশ আছে। আবার দেখলাম বেদে যজ্ঞকে বলা হয় সুকৃত এবং তাই হল কর্ম। আবার যজ্ঞভাবনা না থাকলে সব কর্মই বিকর্ম। গীতা পরিষ্কার করেই বলেছেন যে, শুধু নিজের জন্য স্বার্থভাবনা নিয়ে কোন কর্ম করলে, সেটা বন্ধনই হয়। আবার সেই কর্মই যদি দেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে মুক্তি, আর তা-ই যজ্ঞ। আধুনিকযুগে দেবতার বদলে মানুষকে বসানো হয়েছে। মানবজাতির জন্য, মানুষের প্রগতির জন্য কর্ম ছাড়া কর্ম যে দেবোদ্দেশে হয়, এখন আর তা কেউ ভাবে না। সমাজ স্থিতিকে বজায় রাখাও যে কর্মের উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাচীন কালেও গার্হস্থ্যাশ্রমে অবশ্য করণীয় ছিল পঞ্চ মহাযজ্ঞ—নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞ। সংসারাশ্রমে এগুলি যথাবিহিত অনুষ্ঠিত হলে তবেই তা ধর্মসংসার আখ্যা পেতে পারত। যজ্ঞের মূল ভাব, "ইদং তব ন মম", কিনা তোমারই সব। সেই 'তুমি'র স্থানে আমরা প্রিয়কে না বসিয়ে পারি না। সেজন্য সংসারে ভালবেসে যে ত্যাগ করা হয়, সেটা যজ্ঞ। কিন্তু সেই ত্যাগের মূলে বিরাটের ভাবনা না এলে, যজ্ঞেশ্বরকেও চেনা যাবে না, যজ্ঞভাবনাও ঠিক হবে না। ভাগবতের ভাব অনুশীলন করতে গেলে পাই—"দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।" এই ভাবে আমি ছেড়ে তুমি বা দেবভাব এলেই প্রিয়ের জন্য ত্যাগ সহজে হয়, আর চিত্তও বৃহৎ হয় ও অনন্তে প্রসারিত হতে থাকে। আধুনিক যুগে মানবতার প্রভাবে, মানুষকেই প্রত্যক্ষ

কোটিকেও অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু নির্বিশেষ সুষুপ্তিস্থান পুরুষ প্রজ্ঞানঘন, সর্বেশ্বর সর্বযোনি, আবার তিনিই প্রভু, তিনিই দ্রষ্টা। তাঁরই মধ্যে হারিয়ে গিয়ে যদি হারানোটাকে সত্য বলি, সেটা হল ব্রহ্মের একদেশ দর্শন। কেননা সেখানে থেকেই যে আবার সব বেরিয়ে আসছে, এটা তো ঠিক। না হলে ব্রহ্ম যুগপৎ সুষুপ্তিস্থান পুরুষ স্বপ্নস্থান পুরুষ ও জাগ্রৎস্থান হন কি করে। সুষুপ্তিতে লয় হয়ে ব্রহ্মেই যদি জেগে উঠতে পারি, তবেই পূর্ণযোগের দর্শন সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান হবে। এ দর্শন তো আর বললেই হবে না, হবে তাঁরই প্রসাদে। আগে যেমন বলা হয়েছে যে, স্রোতের চোরাটানে একেবারে তলিয়েই গেলাম এমন যদি হয়, তাহলে কেই বা দেখবে আর মায়াকেই বা কে বুঝবে? সেই যে শুনেছি, নুনের পুতুল সমুদ্রের জলে পড়ে গলে যায়—এও সেই রকম। আবার সেই নুন জমাট বেঁধে পাথরের মত শক্ত হয়ে যেতে পারে, তখন এক অদ্ভুত দর্শন হয়। সুষুপ্তিতেও দেখা যায় সর্বেশ্বর সর্বযোনি সেই নির্বিশেষ চৈতন্য তা থেকে বেরিয়ে আসছে এই জাগ্রত জগৎ ঠিক তুবড়ির মুখ থেকে অগ্নি শিখার মত, আর ঝিকমিক করছে তার স্বপ্নের অবস্থা। অনন্ত শয্যায় সর্বেশ্বর সর্বযোনি নারায়ণকে আমরা এ ভাবেও দেখেছি, যে তাঁর সুষুপ্তি গুটিয়ে আছে, আবার তিনি এমন এক বিদ্যুৎগর্ভ স্বপ্ন দেখছেন, যা জাগ্রতে ভর্গরুচিতে প্রতিভাত। এ তিন অবস্থা একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে রয়েছে, আবার তিনি এ তিনেরও অতীত তুরীয়। ব্রহ্মের মধ্যে যেমন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি একই সঙ্গে থাকতে পারে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও তেমন যুগপৎ সৃষ্টির অতীত থেকেও সৃষ্টিতে সব বিভঙ্গগুলির মধ্যে নেমে থাকতে পারেন। সুষুপ্তি যে শক্তির উৎস, এটা আমরা প্রাকৃত জীবনেও বুঝতে পারি। ঘুমের মধ্যেই শক্তি সঞ্চাত হয়। কাজেই যেটা সুষুপ্ত ও একদিকে শূন্য, সেটাই আবার শক্তিগর্ভ অবস্থা। এটা আমরা প্রাকৃত ভূমিতেই

নৃত্যকলার ছন্দে ঐশ্বর্য ফুটিয়ে চলেছেন। শিবতাণ্ডব তো আছে, তারই সঙ্গে গৌরীর লাস্য। এই রসসমুদ্রের হিল্লোল যদি আমার বাহিরে প্রযুক্ত হয়, তখন দেখতে পাব আমার ভিতরের ঐশ্বর্যই তো সেখানে সুরে ছন্দে তালে লয়ে উর্মিভঙ্গে উচ্ছল। আমি তখন অনুমন্তা। আবার অমি শান্ত ও সমাহিত আছি বলেই আমার প্রকৃতি ঋতচ্ছন্দা ও মধুচ্ছন্দা, তাতে আমিই ভর্তা ও ভোক্তা। যে রসসমুদ্রের কিনারে উপদ্রষ্টা হয়ে ছিলাম, সেই দ্রষ্টা ও দর্শন অদ্বৈত একরসনিবিড় হয়ে হয় মহেশ্বর। এই হল যথার্থ পৌরুষ। একদিকে জীবভাবে দ্রষ্টা পুরুষ তটস্থ, অপর দিকে তারই চিন্ময়ী শক্তিতে 'ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর' হতে পারলে তবেই দর্শন পরিপূর্ণ হয়। এ যেন দুটা জগৎ, অন্তর জগতে পুরুষপ্রকৃতির যুগনদ্ধতা, আর বাহিরের জগৎ-ব্যাপার ব্রহ্মের মায়া বা প্রকৃতির লীলা। এই দুই ভাবই একসঙ্গে আমাদের অখণ্ডদর্শনে সমন্বিত করে দেখতে হবে। যতক্ষণ আমাদের অনুভবে ও দর্শনে না মেলাতে পারব, ততক্ষণ বিরোধ থাকবে। তন্ত্রের সাধনায় এই দুই ভাব মিলিয়ে নেওয়া হয়েছিল তাই প্রকৃতি মায়া সেখানে যথার্থ শক্তি। সেই যে পুরুষ ওই আদিত্যে "অসৌ", আর আমার মধ্যে এই আত্মা "অয়ম্", সেই ও এই এক, তিনি ব্রহ্ম। এইভাবে আমার জীবন মন্থন করে; যেমন পেয়েছি প্রকৃতি ও পুরুষের যুগনদ্ধ সত্তা, ঠিক তেমনভাবে বিশ্বসৃষ্টির প্রাণসমুদ্র মন্থন করলে যাঁর দর্শন লাভ করি, তিনিই ঈশ্বর ও তাঁর শক্তি। আদিত্যমণ্ডলে যিনি পুরুষ, যিনি আত্ম-চৈতন্য, এই ঈশ্বরের শক্তি হলেন তার ধাত্রী। এই শক্তিই মায়া, তাই তিনি মা। তন্ত্রদর্শনে শক্ত্যালিঙ্গিত পরমশিবকেই শক্তিমান্ ঈশ্বর আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সম্যক্ দর্শনে ঈশ্বর ও শক্তির যুগনদ্ধ ভাবের অখণ্ডবোধের 'পরেই ওই তিনটি বিভঙ্গকেই মিলিয়ে দিয়েছেন।

তিনটি ভাবনার ধারা বিশ্লেষণ করে করে আমরা পেয়েছি, ব্রহ্ম

১১

প্রজ্ঞার কর্ম ও চৈত্যপুরুষ

গীতার কর্মযোগের সূত্রগুলিকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়, নেতিবাচক ও ইতিবাচক। নেতির অনুশাসনে অকর্তা হয়ে কর্ম করার নির্দেশ পাওয়া যায়। ভাব হল তটস্থ ও উদাসীন থাকা, আর কৌশল হল ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে কর্ম করা। ইতিবাচক অনুশাসন হল সমস্ত কর্মকে যজ্ঞে রূপান্তরিত করা। আমরা শুনেছি যে, যজ্ঞভাবনা না নিয়ে কর্ম করলে কর্ম বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কর্ম করতে করতে নিজেকে ভগবানের কাছে উৎসর্গ করতে হয়। সংসারের জন্য দেশের জন্য বা বহুজনহিতার্থে যে উৎসর্গকর্ম, তা চরমে যায় যখন বলি "জগদ্ধিতায়"—জগতের কল্যাণে উৎসৃষ্ট সেই কর্ম। কিন্তু এও আলুনি হয়ে যায় যদি না এর পিছনে যজ্ঞেশ্বরকে বসাতে পারি। "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়" কর্ম হলে তবেই উৎসর্গ সার্থক হবে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, কর্মকে দুদিক দিয়েই নিয়ে যোগপথে যেতে হবে। এই অকর্তার বা নেতিবাচক দিকটি যোগের সাহায্যে ধরে রেখে, কর্ম করে তাঁরই সেবা—এই ইতিবাচক দিকটি পরিপুষ্ট হয়, যদি একটা Cause বা মহান আদর্শ সামনে রেখে চলতে পারি। কিন্তু তাঁরই জন্য সব কর্মের মূল্য, এই অর্থ-বোধটি যথাসম্ভব স্পষ্টভাবে ধারণায় আসা দরকার। তিনি ভূমা তিনি বৃহৎ তিনি অনন্ত, সেই তাঁরই শক্তিতে সব কর্ম। কর্ম অতি ক্ষুদ্রই হক আর বিরাটই হক, সেই অসীম অনন্ত থেকেই শক্তি উৎসারিত হচ্ছে, আবার তাতেই পরিসমাপ্ত হয়ে মিশে যাচ্ছে।

কিন্তু কর্মের ভূমিতে এই অসীম ও অনন্তের বোধ এমনি সহজে আসে না, এজন্য অনুশীলন চাই। এতে জ্ঞানের কথা আসে। নিজের সত্তাকে বিরাটে মিলিয়ে যেমন অনুভব করতে হবে, তেমনি আবার বিরাটকেই সর্বত্র অনুস্যূত

দেখতে হবে। তখন যে কর্ম হবে, তা যেমন প্রজ্ঞার কর্ম, তেমন বিরাটের কর্ম। এই রকম ভাবকেই বলা যায় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। "অহং ব্রহ্মাস্মি", "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি" এই সব মহাবাক্য বিরাটে আত্মনিমজ্জনেরই ফল। আমি বিরাট অসীম অনন্ত হয়ে যাই, আবার অসীম অনন্ত ও বিরাটের মধ্যে আমি, যুগপৎ এই বৃহতের ভাবনাতে জীবনের প্রতি ক্ষেত্র উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আবার আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণে কূল ছাপিয়ে অকূলে এক লোকত্তর চৈতন্যে নির্গলিত হয়ে গেলে যে এক চরম শূন্যতা পেয়ে বসে, তাকেই বলা যেতে পারে বুদ্ধের নির্বাণ। সে এক বিরাট শান্ত অবস্থা। শ্রীঅরবিন্দ এই অধিষ্ঠান তত্ত্বের অবস্থাগুলির নাম দিয়েছেন Fundamentabs। অধিষ্ঠান তত্ত্বগুলির ওপরেই শক্তির স্থান। অধিষ্ঠান না থাকলে শক্তির প্রকাশ সম্ভব হয় না। এই শক্তিতত্ত্বকে শ্রীঅরবিন্দ নাম দিয়েছেন Instrumentals। এখন এই অধিষ্ঠানের আধারেই কর্ম উৎসারিত হয়; তা সে ঘোর যুদ্ধকর্মই হক কিম্বা শান্ত গৃহকর্মই হক, সবই করতে হবে শক্তির সহায়ে। অধিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে শক্তির উজানে যেতে হয়, শক্তি সেখানে স্তব্ধ শান্ত সমাহিত এক মৌনে মগ্ন। এই শান্ত নীরবতার মাঝে শক্তিটুকু তার সমূহ শক্তি ব্যূহ করে রাখে, এ শক্তিবোধ অন্তরের। যে কোন সময়ে তার প্রচণ্ড বিস্ফারণ হতে পারে।

মহাভারতের ধারাটি পর্যবেক্ষণ করলে আমরা এই শক্তিবিন্যাসটি ধরতে পারব। শ্রীকৃষ্ণের তিনটি অভিব্যক্তি দেখা যায়। দ্বৈপায়ন কৃষ্ণে ব্যাসচৈতন্য, তাঁর ধৃতিশক্তিসমূহ নিয়ে তিনি ধরে আছেন অধিষ্ঠান। এরপর আছেন যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডব কৃষ্ণ ধনঞ্জয়, তিনি শক্তির প্রকাশের যন্ত্র। আর সমস্তটা যিনি ধরে আছেন, তিনি হলেন বাসুদেব কৃষ্ণ। তিনি সব শক্তিকেই নিয়ন্ত্রিত করছেন, অধিষ্ঠানকেও প্রকাশের শক্তিকেও। এই তিন শক্তির সমন্বয় ঘটলেই বিজয় সুনিশ্চিত—"ততো জয়ম্ উদীরয়েৎ"।

বেদের পুরুষ মূর্ত ও অমূর্ত আর সাংখ্যের পুরুষ অমূর্ত। নেতি-নেতি করে যেখানে যেতে হয় সেই অমূর্ত আত্মাই শুধু আমি নই, মন বুদ্ধি অহঙ্কার এ সব নিয়েই তো আমার অখণ্ড তত্ত্ব। পুরুষের এই সামগ্রিক তত্ত্ব নিয়েই ভগবতদের পুরুষোত্তম, উপনিষদের মহান্ত পুরুষ। আমরা বলে থাকি মহাপুরুষ। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযুক্ত, জগতে অনুপ্রবিষ্ট ভোক্তা মহেশ্বর, তিনিই ঈশ্বর-শক্তি। আর তাঁকেই জানতে হবে যজ্ঞেশ্বর বলে—ঈশ্বর-শক্তি, পুরুষোত্তম-পরাপ্রকৃতি এই যুগনদ্ধ তত্ত্বটি সর্বদা বজায় রেখে। সাধনা করতে গিয়ে আমরা যেন এই দুইকে মিলিয়ে চলতে পারি না, একদিকে ঝোঁক পড়ে গোলমাল হয়ে যায়। কখনও ঝোঁক পড়ে শিবে বা ঈশ্বরে আর কখনও ঝোঁক পড়ে শক্তিতে। শৈবদর্শন শক্তিকে বাদ দেননি কিন্তু ঝোঁক পড়েছে শিবত্বে, আর শক্তিদর্শনে শক্তিই পরমেশ্বরী, শিব পিছনে। শিবশক্তির যুগনদ্ধতা কখনই ভঙ্গ হয় না। সিদ্ধজীবনে এই ঈশ্বরশক্তিকে অবিনাভূত বোধে, দ্বিধাব্যাবৃত্তিকে এক করে জেনে বুঝে নিয়ে প্রাত্যহিক দিনযাত্রায় নামাতে হবে।

এই জানার স্বরূপ কি? ঈশ্বর চিৎপুরুষ আর তাঁর শক্তি চিৎবৃত্তি। তাই তাঁর পুরুষবিধাতার তত্ত্বে (personality) সম্যক দর্শনের পূর্ণতা। এ পুরুষ কিন্তু সাংখ্যদর্শনবর্ণিত পুরুষমাত্র নয়, কেননা সাংখ্যমতে তাঁকে নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা মাত্র করে রাখা হয়েছে। আমাদের মন বুদ্ধি অহঙ্কার সব অপরা প্রকৃতির কবলিত, কিন্তু ভগবানের পুরুষবিধাতার মন বুদ্ধি অহঙ্কার সবই চিন্ময়। তাই তাঁর চিৎবৃত্তির বিচ্ছুরণে জগতের সর্বত্র জীবত্বের উল্লাস। অনন্তকোটি জীবনের প্রাণসমুদ্র থৈ থৈ করছে "অপ্রকেত সলিলরাশির" অন্তরে। জীবাণু (virus) থেকে আরম্ভ করে মহাপুরুষ পর্যন্ত কোটি কোটি অগণিত জীবসত্তা, সবই এই ঈশ্বরশক্তির যুগনদ্ধতা, তাঁর পুরুষবিধাতা। যতই জীবত্বের উত্তরণ ঘটে, ততই চিৎপুরুষের চৈত্যসত্ত্ব বিচ্ছুরিত হতে থাকে সত্তা শক্তি ঐশ্বর্য আর আনন্দরূপে। প্রতিটি বিগ্রহে তাঁরই রূপায়ণ—"রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব"।

সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। ভক্তি দিয়েই পাই আর জ্ঞান দিয়েই পাই সব হারিয়ে তবেই সব পেতে হয়—"সব ছোড়ে সব পাওবে', Fosake all to achieve all। আমি নেই, এই ভাব চলতে থাকে। তিনি ঝলকে ঝলকে আসেন, আর রেখে যান এই নিমিত্ত আমিকে। তিনি সরে গেলেও তাঁর আবেশ তো কাটে না। তিনি হারান বা আমি হারাই, এই বাচ্ খেলার মত যেন খেলা চলতে থাকে। এই ভাবে আসে ব্রাহ্মীস্থিতি—তাঁর সঙ্গে সাযুজ্যমুক্তি, অন্তে ব্রহ্মনির্বাণলাভ। এই জীবনকালেই তাঁর সাযুজ্যমুক্তি লাভ হয়। জলের বুদ্বুদ সমুদ্রে মিশে গেল, কিন্তু সেই মিলনে তাতে তখন সমুদ্রের আবেশ হয় এবং সেই ভাবই হল "মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ"। মানুষের স্বধর্ম হল পুরুষত্তোমের ধর্ম, একাধারে মুক্ত ও যুক্ত হওয়া। অপরা প্রকৃতির কবল থেকে একেবারেই মুক্তি, আর ওই সঙ্গে শুদ্ধা স্বীয়া প্রকৃতির অবরুদ্ধা শক্তি মুক্ত হয়। বন্ধন মুক্তির সঙ্গে সৃষ্টির পরম ধর্মে প্রপঞ্চোল্লাসে, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারই কর্ম করে চলা, এই হল দিব্যকর্মের ভূমিকা, আর কর্মযোগের মূল সূত্রটি এখানেই।

আমার বিশেষ রুচি নিয়ে পথে নেমেছি, কিন্তু কোথাও মনকে বিমুখ রাখব না, এই হল পূর্ণযোগের সাধকের ভাব। সেই কেন্দ্রবিন্দুটিতে ধারণ করে চলেছি যেখানে, আমার সিন্ধু সেখানে তাঁরই সমুদ্রে মিলেছে। পথ চলার সময় সমন্বয়টি হয়তো ঠিক ঠিক খুঁজে পাই না। কেননা জ্ঞানী ও ভক্ত দুজনের পথ চলায় যেমন বিভিন্নতা একটু থাকে, তেমন আবার আমার নিজস্ব পথটিও অপরের পথ থেকে ভিন্ন। কিন্তু ভিতরের দিকে যখন তাকাই, দেখি কাকে চাই? যিনি ঘরছাড়া করে আমার সর্বনাশ করে পথে নামালেন, তিনিই আবার ঘর বেঁধেছেন যে! সবারই সঙ্গে এক মুক্তির বন্ধনে বাঁধা পড়ি—'সর্বম্ আত্মৈবাভূৎ'। সবই আমার সেই মুক্ত আত্মায়, সমস্ত পথই আমাতে। আমি যে বিশ্বপথের পথিক!

আমরা দেখেছি বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করে একা থাকলেন না, সে পথে সকলকে আহ্বান করে নির্বাণের মুক্তি ও শান্তির পথ দেখিয়ে দিলেন ও তা লাভ করবার শক্তি সঞ্চারিত করলেন, এরকম হতেই হবে। শঙ্করাচার্য জগৎকে মায়া বলে বিভ্রম বলে দেখাতে ও বোঝাতে গিয়ে, মায়া থেকে যেন উৎক্ষিপ্ত হয়ে মায়ার জগতেই, ঘূর্ণিহাওয়ার মত প্রচণ্ড গতিতে তাঁর প্রচার কর্ম করে গেছেন। জ্ঞান আলোর মত, প্রকাশ তার ধর্ম। যেমন করে ফুল ফোটে, ঠিক তেমন করেই সত্যের প্রকাশ, আর সেই তার শক্তি। শ্রীঅরবিন্দ একে বলেন সাধর্ম্য মুক্তি। তাঁরই ধর্ম মানুষী আধারে সিদ্ধ হতে থাকে। আর মৃত্যুর মধ্যে যে সিদ্ধি তা হল নির্বাণমুক্তি ; তা নিয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি। আত্মোৎসর্গের পূর্ণতায় বা যজ্ঞকর্মের উদয়নের সার্থকতায় এই দুই ধারাকেই মিলিয়ে নিতে হবে। নির্বাণমুক্তি অধিগত করে তাঁর সাধর্ম্য লাভ করতে হবে।

প্রাচীনকালে যজ্ঞকর্মের মূলে এই ভাবনা ছিল। পৃথিবীতে এখানকার যে অগ্নি, সেই অগ্নি দ্যুলোকের অগ্নি সূর্যে গিয়ে মিলিত হবে। আর সেই দিব্য অগ্নিতে আহুত হয়ে এই অগ্নি রূপান্তরিত হয়ে দিব্য হবে। ভালবেসে যদি তাকে আত্মোৎসর্গ করতে পারি, তাহলে আমার সেই উৎসর্গ অগ্নিশিখার মত উর্ধ্বমুখ হয়ে জ্বলবে। উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর সেই জ্যোতি পরিণত হবে উত্তর জ্যোতিতে, এবং তা থেকে উত্তম জ্যোতিতে। বৈদিক ঋষি এই অগ্নিকে দেখেই বলেছেন, মহিমময় সেই জীবন-শিখা বনস্পতির মত উচ্ছ্রিত হয়ে চলেছে, আর জীবনের আয়তনও বিপুল হতে বিপুলতর হয়ে উঠছে।

এ মহিমময় জীবন কিন্তু প্রাকৃত জীবন নয়। প্রাকৃত জীবন থেকে সাধন শুরু করতে হয়। তখন গোড়ায় বিরোধ দেখা দেয় যে, শ্যাম রাখি কি কুল রাখি। এটা কিন্তু প্রাথমিক পর্ব। বিরোধই যদি প্রবল হয়, জীবনে বৈরাগ্য দেখা দেয়। আর তাঁর দিকে যেতে চাইলে জীবনের সব কিছু ছাড়তে হয়,

তাকে সম্পাদিত করতে হবে। তখন জাগে আত্মজিজ্ঞাসা। নিজকে না জানলে সর্বনাশ, আবার নিজকে জানাও এক দুরূহ সাধন। যে অগ্নিশিখাটি জ্বালিয়ে রাখতে হবে, বারবার তা নিভে যেতে চায়। এজন্য চিত্তদর্পণটি মার্জনা করতে ভুললে চলবে না। ময়লা মাটি পড়ে সেটা আবৃত হয়ে গেলে অগ্নিশিখাটিও আচ্ছাদিত হয়ে যায়। কিন্তু এই চেষ্টা চলতে থাকলে শ্রদ্ধার আবির্ভাব হলে দেখা যাবে এই আত্মার বুকেই যে প্রেমের সূর্য জ্বলে, আত্মদীপ যে এই দেহের ভিতরেই জ্বলেছিল, তা তো জানতে পারিনি। এই আত্মসাক্ষাৎকারের কথাই গুরুবন্দনায় বলা হয়েছে—"আত্মজ্ঞানাগ্নিদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়েছেন, এই আত্মজ্ঞানাগ্নির উদ্বোধন হলে চৈত্যপুরুষ পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত হন।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে এই চৈত্যসত্তা সকলের মধ্যে থেকেও এভাবে স্ফুরিত হয়ে পুরোভাগে আসেন কই? প্রতিটি বীজে অঙ্কুরের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষেতে পড়লে সব বীজকে সমভাবে অঙ্কুরিত হতে তো দেখি না। তাই তাঁর স্বয়ম্বরণের কথাটাই শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নিতে হয়। তিনি যাকে যে ভাবে বরণ করে রেখেছেন, তাকে তাই হতে হবে। যে বনস্পতি হবে, তাকে তো তিনিই সেভাবে সম্ভাবিত করে রেখেছেন! এই স্বকর্ম ও স্বধর্ম কেমন করে ধরতে পারা যাবে, এ প্রশ্ন যদি আবার তুলি, তাহলে দেখব যে, তাঁর জন্য ব্যাকুলতা তীব্র হলে সবটাই ধরা পড়ে। তাঁকে চাইতে গিয়ে বুঝতে পারা যায় যে, তিনি আগে এসে আমাকে ডাক দিয়েছেন, তাই না আমার তাঁকে চাওয়া! নইলে তাঁকে চাইব, এ সাধ্য কি আমার ছিল? বৈষ্ণবেরা বলেন তাঁকে ভালবেসে না পাওয়ার ব্যাকুলতা হল, "হিয়া দগদগি পরাণ পোড়ানি"। তবুও সেই বিরহের আগুনকে বহন করে লালন করে করে বাড়িয়ে তুলতে হবে। সেই আগুনই আমার সর্বস্ব। তিনি সেই 'আগুনের পরশমণি' হয়ে আমাকে ছুঁয়েছেন, আমার হৃদয় উতলা,

সকলের সঙ্গে এক হয়ে চলতে পারেন, তখনই সেই নেতৃত্ব সার্থক হয়—"জোষয়েৎ সর্ব কর্মাণি"। খেলার মধ্যেও দেখা যায়, ছেলের দল খেলছে, তাদের সর্দার সেই সঙ্গে খেলছে। কিন্তু সকলেই বুঝতে পারছে যে, খেলাটা সেই সর্দার ছেলেটিই জমিয়ে তুলেছে, সে না হলে খেলা জমে না। এই হল সবার রংএ রং মিলিয়ে চলা। রামকৃষ্ণদেব গৃহস্থের ঘরের বৌএর তুলনা দিয়ে সাধন-কৌশল শিখিয়েছেন। সংসারের সকলের সঙ্গেই মিলে মিশে বৌটি সকলের জন্যই দিনের বেলায় কাজ করে চলেছে। কিন্তু রাত্রে তার স্বামীর সঙ্গে মধুর রসের এক গভীর নিবিড় সম্পর্ক। আর সেটা তো চাই, না হলে সংসার বিষ হয়ে পড়ে। তেমনি করে তাঁর রসসায়রে বারবার অবগাহন করে সবার সঙ্গে রং মিলিয়ে চলতে হবে। সারাদিন তাঁরই জন্য কর্ম করে, রাতে বাসক সজ্জায় সজ্জিত হয়ে প্রিয়তমের অপেক্ষা। তখন শুধুই তিনি। নিজের চারিদিকে এক চিন্ময় প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে তাঁর সঙ্গে রসনিবিড় আবেশ। শুধু একটা ভয় যে, এ রাত যেন না পোহায়। কিন্তু এ রাত বড় তাড়াতাড়ি পোহায়। তাই এ ভাবে সব কিছু রসিয়ে তুলতে হয়। প্রতি মুহূর্তেই তুহুঁ তুহুঁ, 'হাম্-মা' নয়। এই ভাবে নিরালায় তাঁর সঙ্গে যে রসমাধুর্যের সম্ভার, তাকেই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ও প্রতিমুহূর্তে নিয়ে আসা। যখনই চাই, হাত বাড়ালেই তিনি, এই ভাবে এই জীবনই এক অপরূপ কাব্য হয়ে উঠবে। জীবনে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে না, জীবনে সবটাই তিনি। যতক্ষণ এই কাব্যের রসে জীবন অপরূপ বিস্ময়ে জীবন্ত হয়ে না ওঠে, ততক্ষণ তিনি মায়ের মত আমাকে ঘিরে রেখেছেন। আমি মাতৃগর্ভে শিশু, এই হল সাধনার প্রথম অবস্থা।

অনুশীলনে তাঁকেই সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে একান্তভাবে চেয়ে উজিয়ে যাই, তখন অপরা বিদ্যার প্রতি প্রত্যাখ্যানের মনোভাব আসে। কিন্তু আবার সবই তিনি, এই ভাবের দর্শনে যখন পূর্ণতা লাভ করি, তখন আর প্রত্যাখ্যানের কথাই ওঠে না। অপরা বিদ্যা তখন পরা বিদ্যারই বিভূতি, তারই অধীন।

এ যুগে বিদ্যার সাধনায় মানব জীবনে যে মূল্যবোধ এখন স্থান অধিকার করে আছে, তা হল ধর্ম দর্শন শিল্প ও বিজ্ঞান (Science)। এই চারটি মূল্যবোধের পরেই দিব্যজীবনের আলো এসে পড়বে, সেটাও দিব্যজীবনের জ্ঞানের সাধনা। গতানুগতিক শিল্প ও বিজ্ঞানচর্চা তো আছেই; কিন্তু কোন সাধকের যোগে এ বিষয়ে যদি এক নতুন আলোর দিগন্ত খুলে যায়, তাকে বলা হয় প্রতিভা। এতে তখন এমন কিছু যুক্ত হয়, যাতে বিদ্যার সাধনায় সব কিছুকে নতুন আলোয় উজ্জ্বল করে দেয়। উর্ধ্বতন লোক থেকে এই আলোক সম্পাত সাধকের নিজের কাছেই এক বিস্ময়বোধ নিয়ে আসে। তাকে বলে প্রতিভ সংবিৎ (Intuitive Faculty)। এই রকমে হলে, তবেই অপরা বিদ্যার রূপান্তর ঘটে। প্রাণময় সত্তার ইষ্টার্থের বোধের ওপরেই, বিজ্ঞানের আলো পড়ে তার যথার্থ মূল্য দেখিয়ে ও চিনিয়ে দেয়। তখনই বিদ্যা ও অবিদ্যার কৃত্রিম বিরোধের অবসান হয় এবং বিদ্যার দ্বারাই অমৃত সম্ভোগ করা যায়।

মানুষের জিজ্ঞাসা যখন জাগে, তখন সাধারণ ভাবে তার দুটি ধরণ দেখা যায়—কেন এবং কেমন করে (Why and How)। পাশ্চাত্য মনীষীরা বলেন, কেন এর জবাব দেয় দর্শন এবং কেমন করে এর জবাব দেয় বিজ্ঞান। বিজ্ঞানী যথাসম্ভব তার তথ্যগুলি সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করে সাজিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দেন, কি ভাবে জ্ঞান লাভ করলে সব জানা যাবে; কিন্তু কেন সেরকমটি হল, সে কথার উত্তর তার কাছে মিলবে না। এই রকমটি যে হয়, এটাই ধরা পড়ে। কিন্তু মানুষের জিজ্ঞাসার বৈশিষ্ট্য হল এই, যে শুধু

হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেগুলি জীবনের রসেই সমৃদ্ধ হয়ে জীবনকে উর্ধ্বমুখী করার প্রয়াসী। শ্রীঅরবিন্দ তাই সাবধান করে দিয়েছেন যে, ধর্মের আচরণে মোহগ্রস্ত হয়ে গণ্ডীবাঁধা এক গোঁড়ামিতে বাঁধা পড়ে যে ব্যক্তিগত বিকার—যা থেকে সিদ্ধাই আসে, তা মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়। তাই সামান্য শক্তি লাভ করে বাহিরে প্রচার করে বেড়ানো, মিথ্যা ভাবালুতা নিয়ে স্বার্থমগ্ন হয়ে থাকা, ভাবে উন্মত্ত হওয়া, দাসত্ব করা—এই সব চেতনা অসাড় হয়ে যন্ত্রবৎ বাঁধাধরা পথ ধরে ঘুরপাক খেতে থাকে। এ সব ধর্ম ও দর্শনের বিকৃতি, আমাদের চিত্তের ও বুদ্ধির অশুদ্ধি ও তজ্জনিত বিকারের ফল।

কিন্তু ধর্ম ও দর্শন আমাদের অন্তরের বস্তু, তা পরা বিদ্যারই আশ্রিত। অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে যেমন জ্ঞান লাভ করতে হয়, তেমনি আবার সেই জ্ঞানের আলোয় বাহিরটা দেখতে ও জানতে হয়। সেজন্য ধর্ম ও দর্শন প্রকৃতভাবে অনুশীলন করতে পারলে পরা বিদ্যায় বিদ্বান হওয়া যায়।

আধুনিক বিজ্ঞান দিয়ে জীবনের কর্মকে জানতে হয় ও কলা কৌশলে (Art) সেই কর্মসাধন করতে হয়। জাগ্রতের জীবনে আমরা যে মন দিয়ে জ্ঞান আহরণ করি, এই বিজ্ঞানের এলাকা সাধারণভাবে তাকে অতিক্রম করে না, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই জ্ঞান লাভ করতে চায়। মনের গভীরে যথাসাধ্য অনুপ্রবেশ করে ও তথ্য সংগ্রহ করে সে তত্ত্বটি উদ্ঘাটন করতে চায়। কিন্তু মনের এ দেখা পরাক্ দর্শন (Objective vision), প্রত্যক দর্শন (Subjective vision) নয়। এ থেকে প্রাণবিজ্ঞান (Biology) মনোবিজ্ঞান (Psychology), এসবের বহুমূল্য তথ্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং জাগ্রত চেতনার স্তরগুলি পেরিয়ে গিয়েও এই বিদ্যার বিষয় সূক্ষ্মচেতনাসঞ্চারী হয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত। কিন্তু এসব বিদ্যাকেই বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় করে রাখা হয়েছে; বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়চেতনাকে একাকার করে তত্ত্বটিকে অনুশীলন করা হয়নি। তাই

যায়, সম্পূর্ণভাবে তাঁর পরে নির্ভর করে সহজে তাঁর কর্মের ভার বহন করা যায়। সূর্যকে কেন্দ্র করে সৌরমণ্ডলের গ্রহ উপগ্রহের পরিক্রমা দেখিয়ে কপার্নিকাস্ যেমন চিন্তা-জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন, এও সেইরকমভাবে জীবনের এক কম্বুরেখ আবর্ত ঊর্ধ্বগ সহজ গতিপথ সূচিত করে। জীবন সহজ হয়ে যায় আর তাঁকে নিবেদন করার ইচ্ছাটুকুই অবশিষ্ট থাকে। বিরাটে চেতনার ব্যাপ্তি সর্বদা কর্মের সঙ্গী থাকে বলে, কর্মের বিক্ষোভে দুঃখ ও অবসাদ আর পেড়ে ফেলতে পারে না।

এইরকম করে তাঁকে চেয়ে যত তাঁর সমীপবর্তী হব, ততই চিত্তের উদারতা বেড়ে যাবে, সঙ্কীর্ণতা থাকবে না। তাই চেতনাতে যত কিছু খাঁজ পড়েছে বা মরচে পড়ে স্থানে স্থানে করকর করছে, সে সবই তাঁর দৃষ্টিশক্তির সামনে খুলে ধরতে হয়। তাহলে সেগুলি সবই আবার তাঁর শক্তিতে পরিণত হয়। এইভাবে অসীমের সঙ্গে যোগ রেখে চলার পথে প্রত্যেকের স্বধর্ম অনুযায়ী নিজস্ব পথ করে নিতে হবে। হৃদিস্থিত দেবতাতে একান্তী হয়ে তাঁকে আবিষ্কার করে জানার পথে কর্মযোগে এক তৃপ্তি ও স্বাদ আছে। প্রথমে সে উজ্জ্বল রসধারাটি ক্ষীণ ঝর্ণাধারার মত বইতে থাকে। কিন্তু মূলের সঙ্গে যোগটি সুদৃঢ় ভাবে ধরতে পারলে আর ভাবনা থাকে না। বহু ধারা এসে তাতে মিলিত হয়ে তাকে স্ফীত ও উচ্ছ্বসিত করে তোলে। রামকৃষ্ণদেব যেমন দেখিয়ে গেছেন, সেই রকম সব রকমের সাধকের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে রসাস্বাদন করা যায়। অসীমকে জানার উল্লাসে সেইরকম মহাশক্তিশালী প্রতিভার পরিচয় পেলে, পূর্ণযোগের সাধকও বহুবিচিত্র পথের আলোতে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করতে পারেন। রামকৃষ্ণদেব বলতেন পাঁচডেলে হওয়ার কথা। ঈশ্বরের লীলা আস্বাদনের তো অন্ত নেই, তার কত বৈচিত্র্য। তাই সাধনপথেও কর্মযোগ শুরু করার পর কত কর্ম খোলসের মত খসে পড়ে, আবার যেন নতুন করে যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু পরে দেখা যায়, সব কর্মের ধারাগুলি এসে

মিলেছে ; কোনটি হারায়নি, কিছু খোয়া যায়নি, সবগুলি একত্র গ্রথিত হয়ে বিরাট এক ধারা স্যন্দমান সিন্ধুতে পরিণত হয়েছে। এইভাবে সব কর্মের সার্থকতা। চেতনা যেমন ব্যাপ্ত হয়ে বৃহৎ হবে, সেই বৃহৎ সামের ছন্দে জীবনের সব কিছুই তেমন ছন্দোময় হবে। ঈশ্বরের কর্ম বলেই সংসারের তুচ্ছ কর্মও বৃহতের আবেশে সরস হয়ে উঠবে, জীবন সহজ ও সুন্দর হবে।

তাহলে এই সহজ অবস্থার গতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি উৎসর্গের ধারাটি কিভাবে তার লক্ষ্যে পরিণতি লাভ করছে। প্রথম ভাবটি হল আমার সব কিছু তোমার। সমস্ত জীবন ধূপ-শিখার মত জ্বলে তোমার দিকেই উড়ে চলেছে। দ্বিতীয় অবস্থার ভাব এলে দেখি, এ তো অজানা সমুদ্রে ঝাঁপ দিইনি ; তিনিই তো এসে তাঁর কর্মের ভার দিয়ে আমাকে তার নিমিত্ত করেছেন। এ ভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি আমি হয়ে গেছেন। দূরে তুমি অসীম, অন্তিকে তুমিই সসীম। তখন শেষ পর্যন্ত দৃষ্টি বদলে যায়, আর তোমাকে কেন্দ্র করে উর্ধ্বগতি হলে দেখি—এ আমি তুমিই। এইভাবে অসীমের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ হয়। মন ও বুদ্ধির ওপারে ঈশ্বরের জ্ঞান হলে বোধির রাজ্য খুলে যেতে থাকে। তখন সেই প্রজ্ঞার শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে প্রজ্ঞার কর্ম সিদ্ধ হয়ে চলে। চৈত্যপুরুষ পুরোধা হয়ে এই সহজ অবস্থাকেই নিয়ে যান ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতায়। তখন ষোড়শকল আধ্যাত্ম সিদ্ধিতে এক মহাসমন্বয়ী শক্তির আবির্ভাবে প্রকৃতির মহত্তর চিন্ময় রূপান্তর সাধিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ এরও আগে নিয়ে গেছেন তাঁর পরম সমন্বয়ী সিদ্ধিকে, যাকে বলেছেন অতিমানসী সিদ্ধি ও অতিমানস রূপান্তর (Supramentalisation, supramental transformation)। কিন্তু সিদ্ধচেতনাতেও সে অনেক পরের অবস্থা।

বোধির কথা আমরা অনেকবার উল্লেখ করে থাকি। মন দিয়ে শুধু ভাবনা করে, তাকেই অবলম্বন করে সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না, যতক্ষণ তার উপরে বোধির আলো এসে না পড়ে। পূর্ণযোগের সাধনে এই বোধির ঘটকত্ব

বিজ্ঞানের আলো এসে পড়ে। তবুও তার প্রাকৃত সংস্কারগুলি মগ্নচেতনায় ঢাকা থাকতে পারে, আর সেই কারণেই সমস্ত সাধনা সেখানেই নিরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

অতিমানস বিজ্ঞানলোকে পৌছানোর কয়েকটি ভূমি ক্রমপরম্পরা হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়ে দিয়েছেন। মনকে ক্রমসূক্ষ্ম করে তুলে নিয়ে গলিয়ে রূপান্তরিত করতে হবে, এই প্রজ্ঞার কর্ম। মানস বৃত্তিগুলি জোর করে যেমন বন্ধ করা যায় না, তেমন আবার ওপরের আলো জোর করে টেনে নামালেও অশুভ সংস্কারগুলি অব্যক্ত মনের অংশে চলে গিয়ে পরে আরও জোরালো ভাবে সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে। পূর্ণযোগের পথ সর্বাবগাহী পূর্ণতার পথ। মনের সম্যক্ পূর্ণতাও ওই অতিমানসে। যে কোন পথ ধরেই মন জ্ঞানের চূড়ায় পৌছতে পারে, কিন্তু অনন্তের ঐশ্বর্য অনন্তভাবে তাতে জানা যায় না। মনকে কেটে ফেলে দিতে হবে না ; সর্বগ্রাসী অনন্ত চেতনার অধিষ্ঠানে বিজ্ঞানের বিচিত্র ঐশ্বর্য নিয়েই, সম্যক্ জ্ঞানে মন পূর্ণতা লাভ করবে। উত্তর-মানস (Higher Mind), প্রভাস-মানস (Illumined Mind), বোধি-মানস (Intuitive Mind) এবং অধি-মানস (Over Mind) — অতিমানস (Supermind) পর্যন্ত মনের এই ভূমিগুলি অদ্বৈতচেতনায় সিদ্ধমনের ভূমি। তারও আগে যেতে হবে। এক নির্মুক্ত চেতনায় দিব্যমনের লক্ষণ আবেশে স্ফুরিত হতে থাকে। অতিমানসের পানে উত্তরায়ণের পথে ওই চারটিই মানসোত্তর বিজ্ঞানের ভূমি ; এগুলিকে যথাসম্ভব বুঝে নেওয়া যাক।

প্রাকৃত মনের সঙ্গে উত্তর-মানসের মূল বিভেদ হল এই যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মনের সংস্কার ছাপিয়ে উত্তর-মানসের দৃষ্টি চলে যায় তার পিছনের ভাবে। তখন গোড়ায় থাকে ভাব ও তা থেকে ইন্দ্রিয়-সংবিৎ। সে ভাব বিশ্বগ্রাহ্য। সেজন্য দেখা যায়, ইষ্টদর্শন বা ধ্যানজ্যোতিদর্শন লাভ হলে তাই ধরে সে পথের নিশানা পায়। সে দর্শনের ভাব তার কাছে ইন্দ্রিয়দর্শনের চেয়ে অনেক বেশী

প্রাণে ও ইন্দ্রিয়ে ও দেহচেতনাতেও উত্তর জ্যোতির দীপ্তি ও বীর্যকে ছড়িয়ে দেয়। তাই একেই বলা যায় ব্যক্তিসত্ত্বে প্রতিষ্ঠার ভূমি।

বোধি-মানস পর্যন্ত থাকে চিদ্‌বৃত্তির একাগ্রতা; তা উর্ধ্বমুখ তীরফলকের মত বিষয়ের আবরণ ভেদ করে তার মর্মসত্যকে আবিষ্কার করে চলে। এ থেকে বস্তুর মূলে চিন্ময় ভাব রূপ স্পর্শের সংবিৎ উন্মেষিত হয়। এইসব চিদ্‌বৃত্তির উৎস হল এক সংহত আত্মসংবিৎ। আত্মসংহত বিশ্বব্যাপ্ত সেই চেতনায় নিজেকে অনুভব হয় বিশ্বতশ্চক্ষুর চক্ষু বলে। অনন্ত পুরুষের অনন্ত চক্ষুতে রাসচক্র জেগে উঠল বিচিত্র ভূতিতে (becoming in manifold ways)। যে আমি তখন বিশ্বসমুদ্রের বুকে আলো হয়ে দোলে, তার বোধে সংক্রামিত হয় বিশ্বাত্মারই সম্যক্ সম্বোধি (Spiritual Intuition)। এই হল অধিমানসের ভূমি।

অধিমানস এক সংবর্তুল চেতনার (global) ভূমি। মানস প্রত্যয়ের তা চরম ও পরম প্রতিষ্ঠা। এই ভূমিতে প্রেম জ্ঞান শক্তি, তাদের বৈশিষ্ট্য রেখেও একসঙ্গে থাকতে পারে এবং তা থেকে সাধক ভক্তি জ্ঞান কর্মযোগে, তার নিজস্ব দিব্য ধারাটির ক্রিয়ার অবরোহণের পথটিও পেয়ে যাবেন। চেতনার এই উত্তুঙ্গ ভূমিতেও কিন্তু চিদ্‌বৃত্তির প্রগতি শেষ হয় না। তাই পরমা প্রকৃতির অনধিগত রহস্য তখনও অনধিগত থাকে বলেই পরম সাম্যের সম্যক সিদ্ধি সম্ভবপর হচ্ছে না। সেই নিগূঢ়তম রহস্যই হল অতিমানস।

সাধনার দিক থেকে অধিমানস আর অতিমানস একেবারে মুখোমুখি হয়ে আছে। অতিমানসের চাপেই জড় অধিমানস পর্যন্ত ঠেলে ওঠে। এও অতিমানসের বিভূতি, একে সহজ একান্ত বিভূতি হতে হবে। গীতায় যেমন অর্জুনের জিজ্ঞাসা থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্যদর্শন দিয়ে দিব্যজ্ঞানও দিয়ে দিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-হৃদয়ে গলে মিশে গিয়ে, গীতা হয়ে যদি অর্জুন গীতা বুঝতেন তাহলে সমগ্র গীতা সম্যক্‌রূপে উদ্ভাসিত হতে পারত। প্রজ্ঞা প্রেম

শক্তি সেখানে একেরই বিভূতি। গীতাতে প্রজ্ঞার দিকটি পরিস্ফুট, কিন্তু নেপথ্যে যে ভাগবত প্রেম, সেখানে তারও আবরণ ঘুচে গেছে। জ্ঞানকে ঠেলে দিচ্ছে সেই ভাগবতধর্মের রাসচক্র (Supramental)। এক্ষেত্রে অধিমানস ও অতিমানস নিয়ে ছোটবড়র কোন কথা আর নেই, যেদিকে তিনি দৃষ্টি ফেলছেন, তাঁর কর্মের অভিব্যক্তিকে যেভাবে সম্ভূত করছেন, তাই নিয়েই সম্যক্ দর্শন। অর্জুনের সারথি হয়েও তিনি দুর্যোধনের প্রেমিক। এ পর্যন্ত না যেতে পারলে তো মানস-সংস্কার শেষ পর্যন্ত যায় না ও তা না হলে একরস প্রত্যয়ও সম্যক্‌সিদ্ধ হতে পারবে না। কিন্তু সে রূপান্তর ঘটানো মানস প্রকৃতির সাধ্য নয়, তার সাধ্যের সীমা অধিমানসের উন্মীলন পর্যন্ত। দিব্য অতিমানসকে অধিমানসের মধ্যে পূর্ণভাবে কাজ করতে দিতে এক প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—Inscrutable Supermind leaning on Earth; অতিমানস সবার মূলে অধিষ্ঠান হয়ে আছেনই। তাকে ছেড়ে বিশ্ব-ব্যাপার হতেই পারে না। তবুও তার শক্তি পার্থিব লোকে এখনও প্রকট হয় নি।

প্রাকৃত মনের সামান্যভাবনার বৃত্তি ধরে সাধনার পথে অতিমানসের পানে উঠে যেতে সোপানগুলির বিবরণ পেলাম। মনের আড়াল ঘুচাতে তাকে অতিমানসের ধারা ধরেই লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে, আর সেইভাবে প্রজ্ঞার কর্ম সংসিদ্ধ হয়ে চলবে। এভাবে ধর্ম দর্শন শিল্প বিজ্ঞান জীবনের সর্ববিদ্যায় প্রজ্ঞানকে নামিয়ে এনে কর্মকে উত্তরভূমিতে নিয়ে যেতে হবে। ব্রহ্ম তার সম্যক্ জ্ঞান নিয়ে যেমন কর্ম করে চলেছেন, দিব্যকর্মে তাঁর মত হয়ে কর্ম করতে হবে—দিব্যকর্মযোগের ওই সুদূর নিশানা। শ্রীঅরবিন্দের যোগ সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

অন্তিকে বসে তিনিই মিষ্ট তিক্ত কষায় সব কিছু রস পান করে চলেছেন—'স্বাদু পিপ্পলম্ অত্তি'। তাঁর সম্বন্ধে বেদ বলেছেন—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষ পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।।"

এই স্বাদু পিপ্পলাদ হলেন চৈত্যপুরুষ, আর অপর কূটস্থ চিদাত্মা—অনশ্নন্ অভিচাকশীতি, তিনি দ্রষ্টা কিন্তু ভোগ করেন না। দুটিকেই সদাযুক্ত একজোড়া সুপর্ণ বলা হয়েছে, তারা একই বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে আছে। তাই জীবনের সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ যা-কিছু ভোগ, তা সবই চৈত্যপুরুষের অন্ন। ভালবাসা চৈত্যপুরুষের ধর্ম, কিন্তু সে ভালবাসার ভোগের মধ্যে কূটস্থ আত্মা জেগে থাকেন। তাই ভালোবাসার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাকে জাগিয়ে রাখতে হয়।

গীতা বলেছেন ভাবসংশুদ্ধি চাই। আবার বলেছেন "রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে"। প্রজ্ঞাধৌত নির্বিকার চিত্তেই বিশুদ্ধরস সঞ্চারিত হয়। তাতে প্রজ্ঞাবান পুরুষ আত্মারাম আনন্দঘন, আর তাঁর আনন্দের বিলাস প্রকৃতিতে উচ্ছলিত, যাকে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র বলেন রস ও রতি। এইভাবে জ্ঞানাত্মা চৈত্যপুরুষের আনন্দঘন ভাবের উচ্ছলনে (ecstasy), সাধকের আত্মদানের অভীপ্সায় বিগলিত হয়ে উজিয়ে ওঠে। এই হল তাঁকে পাবার প্রশান্ত ব্যাকুলতা। আর তাতেই অধ্যাত্ম সাধনার প্রধান প্রবেশ-পথটি উন্মুক্ত হল। এর অভিব্যক্তি প্রতিটি সাধকের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু জীবনের ও সাধনের অধিকাংশ বৃত্তিই হল এই শুদ্ধ ভালবাসা। একেই বলে ভগবানের প্রতি আসক্তি, যাকে মরমিয়া বলেছেন "লগ রহ ভাই।" এই প্রেমের যোগটি চাই-ই। শ্রীঅরবিন্দ যেমন বলেছেন মায়ের ভালবাসা; বলা যায় মা-ই (SHE) ভালবাসা (LOVE)—পরম পুরুষের হৃদয়। পিতা উচ্চে সমাসীন, নির্বিকার দ্রষ্টা আর কর্মরতা মা যে আমার সঙ্গেই। তাঁর কাছে যাই আপীল করি, তিনি শুনবেন। তাই তার প্রতি জন্মগত সহজ আসক্তি

মূঢ় দেহাশ্রিত ভালাবাসাই প্রজননের কর্ম করে চলেছে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সেই কামলীলাই রিরংসারূপে বয়ে চলেছে। কোথা থেকে তার অন্ধ প্রবেগ, সেটা বলা যায় না। এক creative urge পিছন থেকে আকর্ষণ করে পশু মানব সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। তারও এক রস ও সৌন্দর্য আছে, যা মাদক-রসের সৃষ্টি করে। ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত ভূমি পর্যন্ত এই ধূমাচ্ছন্ন মলিন রসেই প্রাণ ও মন জেগে তাকে আলোকিত ও কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। তখন যে আদর্শবোধ দেখা দেয়, তা গার্হস্থ্য জীবনের সংযত পুরুষে ও সতী স্ত্রীতে দেখা যায়। কিন্তু ওই আকর্ষণে গভীর থেকে এলেও আত্মসচেতনতা না থাকলে এর অন্ধ প্রবেগ ভাসিয়ে নিয়ে আদর্শ থেকে চ্যুত করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাব্যে ও সাহিত্যে এই মাদক-রসই উপজীব্য। তাই ভালবাসার পরীক্ষায় দেহকে ছাপিয়ে প্রাণময় ও মনোময় হয়ে তা যখন একাগ্র ভূমিতে যেতে পারে, তখনই যোগশক্তি তাতে সচেতনভাবে যুক্ত হয়। তা থেকে ভালবাসার আদর্শবোধ আবার দেহ ও প্রাণেও সংক্রামিত হয়। চিত্ত একাগ্র হবে, না হলে তাঁর বিজ্ঞান ও আনন্দের শুদ্ধ রূপ সে রসে স্থিত হতে পারবে না। একাগ্রতায় তল্লীন হয়ে চিত্ত পরিণামে নিরুদ্ধ হয়ে যাবে।

এদেশে ওই একাগ্র ভূমির ভালবাসাতেই সতী নারীর চিত্তে "পতি পরম গুরু" এই সত্যের প্রতিষ্ঠা ছিল। পুরুষের রাশ খোলা থাকা সত্ত্বেও এদেশের নারীচিত্তের প্রবল সংস্কার ছিল যে, স্বামীর প্রতি ভালবাসা দেবতাতেই আত্মনিবেদন। ভগবানকে হৃদয় দিলে সে ভালবাসা হয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব। ভক্তিপথের সাধনায় ও রসশাস্ত্রে আমরা এই ভালবাসার পরিচয় পেয়ে থাকি। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও একটা ত্রুটি সেখানে থেকে যেতে পারে। প্রেমের গভীরতা ও তুঙ্গতা দিয়ে নিজ দেবতাতে একান্তী হয়েও অন্যমতের সঙ্গে সংঘর্ষ এসে পড়তে পারে। তাতে সংসারের সঙ্গে ও জগতের সঙ্গে বিরোধটাই প্রবল হয়ে ওঠে। এই কারণে একাগ্র ভূমিতে উঠেও চিত্তের প্রেম ঠিক পূর্ণভাবে মুক্তি

পায় না। হৃদয়ের প্রসার ও ব্যপ্তিবোধ নাও আসতে পারে। ইষ্ট-গোষ্ঠী ধর্মসংঘ এসব করেও সেখানে যেন আটকে যেতে হল, এমনও হয়। অথচ শুদ্ধচিত্তের এই প্রেম খাঁটি বস্তু। গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আমরা প্রত্যেক ধর্মসংঘের মধ্যে, বিভেদটাই স্পষ্ট হতে দেখেছি। পরস্পরের মধ্যে ভাবের মিলনটি যেন সংঘটিত হতে পারেনি। মতান্তরের সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ বন্ধ হওয়ার তো কোন কারণ নেই। তাই মনে হয়, সে ক্ষেত্রে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় দিয়ে পূর্ণ মিলনটি হয়নি। অথচ প্রত্যেকেই নিজমতের প্রতি একনিষ্ঠ।

এরই প্রতিক্রিয়ায় বোধকরি এ দেশেও এক ভাবের ঢেউ এসে পড়ে যে, মানুষকে ভালবেসে মানুষের হিতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাই শ্রেয়। সেই শ্রেয়ের পথে ভগবানকে বাদ দিলেও বুঝি কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু সে ভাবে প্রেমের সার্থকতা হয় না, কাজেই সে সেবাকর্মও সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। আবার সকলের ভাল করতে গিয়ে নিজের অহং এমনভাবে স্ফীত হয়ে উঠতে পারে যে, নীতিবোধের দোহাই দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়তে হয়। অধুনা রাজনীতির ক্ষেত্রে ত্যাগী নেতাদের পর্যন্ত কি করুণ পরিণতিই না লক্ষ্য করা যায়। তাই ভগবান স্বয়ং যেভাবে ভালবাসেন, তাঁর হৃদয় ধ্যান করে তাতে মিলিত হয়ে নিজেকে একেবারে গলিয়ে দিয়ে যদি ভালবাসাই হয়ে যেতে পারি, তখন নিজের মধ্যেই তাঁর সেই মাধ্বীধারাটির উৎস খুলে যেতে দেখব। তাই বলা হয়েছে একাগ্র ভূমির প্রেম নিয়ে উজানে গিয়ে নিরুদ্ধ ভূমির প্রেমরসে নিজকে হারিয়ে শূন্য হয়ে যেতে হবে। একাগ্রতার ফলে বহুমুখী চিত্তবৃত্তি-গুলিই গভীরে প্রবেশ করে নাস্তিবৎ এক শূন্যতায় প্রেমসমাধিতে মগ্ন হয়ে যায়। এই ভাবেই পরমপুরুষের বুকে প্রকৃতি আত্মহারা হয়ে ঢলে পড়ে; যেমন করে কালিদাসের চিত্রে তপস্বিনী উমার প্রেমকে দেখানো হয়েছে। আবার উমাই শিবের হৃদয়, শিবের ভালবাসা। আত্মারামের মহাশূন্য আকাশ-হৃদয় তো প্রকৃতির প্রেমেই আত্মহারা—সে এক মহাসমাধিমগ্ন মৌন অথচ প্রেমনিবিড়

অদ্ভুত স্বলসিত রস। এই পরমপুরুষ আনন্দে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই বিশ্বজগৎকে আকর্ষণ করেন প্রেমের শক্তিতে। কৃষ্ণের আকর্ষণে তাই গোপীচিত্ত উতলা হয়ে ছুটে আসে, তাঁর প্রেমে আত্মনিবেদন না করে সে পারে না। কেননা আপূর্যমান অচলপ্রতিষ্ঠ সেই ভালবাসাই তো গোপীকে সম্মুখে এনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁরই পরমা প্রকৃতি রাধা। এই ভাবে পুরুষের প্রেমকে যেন আত্মারাম করে দেখনো হয়েছে—তিনি অচলপ্রতিষ্ঠ থাকেন প্রেমে, আর প্রকৃতি তাঁর প্রেমেই তাঁর দিকে ছুটে চলেছে। তাই তাঁরই প্রেমের আকর্ষণে তাঁর দিকে যে উজানে চলা—সেই ভাবকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন চৈত্য ভালবাসা (Psychic love)।

এই চৈত্যভালবাসা অতুলন, কিন্তু তাই বলে প্রকৃতিকে এখানে যেন ছোট মনে করা না হয়। পরমপুরুষের হৃদ্যসমুদ্রে নিঃশেষ আত্মসমর্পণে সেই ভালবাসাই অদ্বৈতনিবিড় প্রেমরসে গলে একাকার হয়ে যাবে। আর সে পর্যন্ত না যেতে পারলে প্রেমের ক্ষেত্রেও যেন বুদ্ধিগত থেকে যায়। চৈত্যপুরুষের প্রেম বা চৈত্য ভালবাসা বুঝতে, গেলে ডুবতে হবে অকূল সেই তত্ত্বে। প্রেমকে সমুদ্রের সঙ্গে একাত্ম করে দেখানো হয় তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা। বেদে ও উপনিষদে এই প্রেমের তত্ত্বটি বিভিন্ন ভাবে উপস্থিত থাকলেও শ্রীঅরবিন্দদর্শনেই প্রথম এই আলোর, মাধ্বীধারাটির এক পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। জীবের হৃদয়ে ভগবানের আবেশে তাঁরই একটি স্ফুলিঙ্গ চিৎ-কণরূপে অধিষ্ঠিত, আর সেই বিন্দুটিকে বেষ্টন করে এক জ্যোতির্ময় নীহারিকা ছন্দায়িত হয়ে চলেছে—এই হল চৈত্যপুরুষ। ছোট্ট একটি পুরুষসত্তা যিনি দেহাস্থিত শুদ্ধসত্ত্বরূপে প্রকাশিত হন, তাঁকেই কঠোপনিষদ বলেছেন "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা"। তিনিই হলেন জীবের ভূতভব্যের ঈশান। এতদিন যা ছিলাম, যা হয়েছি ও যা হতে চলেছি, সব তাঁরই ঈশনায়। শ্রীঅরবিন্দ এঁকে soul বলেও উল্লেখ করেছেন। জীবন-রসের এই রসিক পুরুষটিই সরস বিরস সব রকমের অঘটন ঘটিয়েও

জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভোজন করে আমরা সেই স্বপ্নের সৌরভ ও আবেগের দীপ্তি জীবনে হারিয়ে ফেলি। বিষয়-বিষ বিকারে চিত্ত মলিন ও বিকৃত হয়ে পড়ে—এই হল জীবনের অভিশাপ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "পতিতা" কবিতায় পতিতার কণ্ঠে এই নিষ্ঠুর সত্যটি শুনিয়েছেন, "নগরের ধূলি লেগেছে নয়নে, আমারে কি তুমি দেখিতে পাবে?"

শ্রীঅরবিন্দ যে ভাবে চেতনার স্তরবিন্যাস করেছেন, তাতে চৈত্য-সত্তার স্থান মনের আগে প্রাণের পরেই। সৎ চিৎ আনন্দ অতিমানস (বিজ্ঞান) উর্ধ্বলোকের স্তরে, যাকে বলা হয় পরার্ধ। আর অপরার্ধে দেহ প্রাণ চৈত্য ও মন, এইভাবে স্তরগুলি বিন্যস্ত রয়েছে। আনন্দলোকের রসচেতনাই অবর লোকের চৈত্যসত্তায় প্রতিফলিত। আনন্দধামে আনন্দময় পুরুষ ও চৈত্যপুরুষ যেন মুখোমুখি হয়ে আছেন। দেহ প্রাণ ও মন তিনই মলিন হয়ে যায়, তাদের পরিশুদ্ধ করলে চৈত্যপুরুষ সম্মুখেই থেকে যান। বুদ্ধির শুদ্ধি ও রসসংশুদ্ধির কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। প্রাণের শুদ্ধির জন্য প্রাণের উত্তালতাকে সংহত করতে হয়। কাচের চিমনি পরিয়ে যেমন অগ্নিশিখাকে শোভন ও সুদীপ্ত করে জ্বালাতে হয়, তেমনি করে প্রাণের এই উত্তালতাকে স্বচ্ছ নির্মল আলোর আবরণে রক্ষা করে একমুখী উর্ধ্বশিখ করতে হবে। এই ভাবে প্রাণাগ্নির প্রজ্বলন শুদ্ধপ্রাণের লক্ষণ। এই অধূমক জ্যোতি প্রাণস্পন্দেরই, কিন্তু তাতে কামহত বাসনার উত্তালতার মালিন্য নেই। ইন্দ্রিয়শক্তিকে এইরকম করে মূল প্রাণশক্তির প্রশাসনে আনতে পারলে, চিত্ত আর বানচাল হতে পারে না।

পরিশেষে দেহের শুদ্ধির কথাও এ প্রসঙ্গে তুলতে হয়। দেহের জড়ত্ব এক ভারের মত যোগবিঘ্ন ঘটিয়ে চৈত্যপুরুষকে আড়াল করতে পারে। আলস্য প্রমাদ এই সব বৃত্তিগুলি তমোগুণ থেকে উদ্ভূত; এই জড়ত্বকে যথাসম্ভব লঘু করতে হবে। আহার-শুদ্ধি তার এক প্রধান উপায়। উপনিষদ বলেছেন,

সবই তাঁর স্বীয়া প্রকৃতির বিভঙ্গ। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের চিরকৈশোর লীলা—একদিকে যেমন দিনের আলোয় সখাদের সঙ্গে গোচারণ, অপরদিকে জ্যোৎস্না রাত্রে সখিদের সঙ্গে রাসের মিলন। কালের রাখাল তিনি আমাদের গোপাল। আমাদের প্রাণ হল পশু—পশবঃ বৈ প্রাণাঃ। সেই পশুপ্রাণ আলোর পিপাসী হলেই হয় গো। সকালে গোষ্ঠের আগড় খুলে সেই গোযূথ নিয়ে তিনি রাখাল হয়ে চলেন, আবার সন্ধ্যায় তাদের গোষ্ঠে ফিরিয়ে আনেন। এই রকম করেই প্রাণগোপাল গো-চালনা করেন। এই প্রাণেরই উন্নততর চেতনায় অর্জুন তাঁর সখা, আর তিনি তার সারথি। কুরুক্ষেত্রের প্রকৃতি যাজ্ঞসেনী তাঁর সখী, সে সখ্যও অপূর্ব। রামকৃষ্ণদেব বলতেন বার বছরের বিধবা ব্রাহ্মণের মেয়ের মত হতে চান। কি সেই বাল-বিধবার আভিজাত্য! তার ভালবাসার কৌলীন্য থেকে তাকে কেউ টলাতে পারে না। সেই রকম সখীর ভালবাসা বীর্যবতী হলে পাই যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণাকে। তিনিই মহাভারতের মহাসমরের নায়িকা, নেপথ্যে ওই যুদ্ধের পরিচালিকা। সেখানে যুদ্ধ করছেন অর্জুন-কৃষ্ণ, যুদ্ধের সারথি বাসুদেব কৃষ্ণ আর যুদ্ধের কারণ যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণা। দিনের প্রখর আলোয় প্রকৃতিকে যেমন সখ্যরসে এই যুদ্ধের চিত্রে দেখা গেল, সেই রকম রসচেতনা নিবিড় হলে আবার পাই বৃন্দাবনের কিশোর কিশোরীকে। এ সবই চৈত্যপুরুষের (psychic being) লীলা। তিনি দেহপুরে জাগ্রত হলে এই ভাবেই লীলারসে ও কর্মের বীর্যে স্ফুরিত হয়ে চলেন। মূলে সেই পুরুষোত্তম—তিনিই নারীচিত্ত পুরুষচিত্ত দুয়েরই নায়ক ও ধারক। এই দুইকে অবলম্বন করেই চৈত্য ভালবাসা (psychic love)। সে ভালবাসায় দুই-ই এক; দুই-এ মিলে এক; দুই-এর প্রত্যেক এক হয়েও দুই মিলে লীলারস আস্বাদন করে পুষ্ট করেন।

প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই ভাবে আমরা একই তত্ত্বকে জ্ঞান ও প্রেম দুই ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখছি। মানুষের মধ্যে বুদ্ধি ও হৃদয় এই দুই প্রধান বৃত্তি

অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সব কিছু জেনে সব ছাপিয়ে লোকোত্তরে হারিয়ে যাওয়াকে জ্ঞানের চরম ভূমি বলে জেনেছি। সেই লোকোত্তরের সর্বনাশা জ্ঞান যেমন রয়েছে অধিষ্ঠান হয়ে, তেমনি তাকেই আবার নেমে আসতে হয়েছে সৃষ্টিতে অণুরও অণিয়ান, মহতেরও মহীয়ান সব কিছু প্রকাশের মূলে। বিশ্বমূল তত্ত্বই বিশ্বাতীত। জিজ্ঞাসা যখন জাগে, তার পিছনে ধাওয়া করে দেখা যায় অজানা হয়ে থাকাই তাঁর স্বভাব, তিনি যেন সৃষ্টির পিছনে লুকিয়ে আছেন। এই পরম পুরুষের প্রকৃতিই তাঁর পরম প্রেমস্বরূপ। পুরুষের আনন্দ রসসৃষ্টির মূলে, তাঁর অনন্ত প্রেমের অবতরণেই এই রসসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এই পুরুষ-প্রকৃতি শিব-শক্তি চিদানন্দ-স্বরূপ। এ তো শুধু বিচারে ও ভাবে বুঝলে হবে না, তাঁকে এখানে প্রতিষ্ঠিত দেখতে হবে। তাই জানতে সাধ যায় না কি—কি সেই পরম জ্ঞান, যাকে আশ্রয় করে পরম প্রেমের দিব্য আহুতি সম্ভব হয়েছে? আর সেই ভাবের দিব্যকর্ম তো আমাদেরও কর্ম-যোগের লক্ষ্য।

সাংখ্য বলেন জ্ঞান অনন্ত জ্ঞেয় অল্প। একটা ঘাসের শিসকেও কি আমরা পরিপূর্ণ ভাবে জানতে পেরেছি, বলতে পারি? প্রতিটি সীমিত জ্ঞানকে ধরে আছে অখণ্ড সমগ্র জ্ঞান। সেই অসীম অনন্তের বোধে প্রতিভান উদিত হয়। অনুভাব আবেশ এইভাবে চেতনায় তার ক্রিয়া। ঘরের দরজা জানালা সব খুলে দিয়ে হাট করে, তাঁর নিত্যপ্রকাশ সেই আলোকে পরিপূর্ণ ভাবে সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে পেয়ে তবে জানতে হয়। তিনি অনন্ত, জ্ঞানও অনন্ত তাঁকে জানার বিভাবও অনন্ত। রূপে রূপে প্রতি রূপে তাঁকে জানতে গিয়ে তাঁর মূর্তিকে দেহ দিয়ে না জানতে পারলে জানাও পূর্ণ হয় না। তিনি সচ্চিদানন্দময়—আত্মায় এক হয়ে একাকার হয়ে তাঁকে যেমন জানতে হয়, তেমনি সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহরূপেও তো তাঁকে জানতে হবে। তাই বলা যায় যেমন লোকাতীত জ্ঞান আছে, তেমনি লোকাতত লোকে লোকে লোকী—এই সব

প্রথম দিকে সংসারের সঙ্গে ভাগবত ভাবের একটা বিরোধ লাগেই, তখন আমরা আশ্রম মঠ মহাপুরুষ-সঙ্গ এই সব খুঁজি। একাগ্রতার সাধন পেয়েও সমন্বয় করা সহজ হয় না। দেখা যায় ভগবান ভালবাসা, সে সহজ নয় কঠিন তার সাধন। কিন্তু উপাসনা করে তাকে কিছুটা আয়ত্ত করতে পারি। সংসারে থেকেও কিছুটা সময় চিত্তকে বন্দী করে একাগ্র করার সাধন সাধতে হয়। বিগ্রহের উপাসনাতেও ভগবানকে ভালবাসার স্বাদ পেয়ে ভালবাসার তুঙ্গভূমি সহজে অধিগত হতে পারে। এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রামকৃষ্ণদেব দেখিয়েছেন তাঁর ভবতারিণীর বিগ্রহ-উপাসনায়।

কিন্তু সেও কি সাধারণ লোকের কাছে সহজ হয়? তামসিক উপাসনার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ রাগ করেই বলেছেন যে শাক দিয়ে মাছ ঢেকে লাভ নেই। "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? ·· মানুষকেই ভালবাসতে শিখলি না, ঈশ্বরকে ভালবাসবি কি করে?" আবার মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে ক্রমে এই ভাবই আসতে হবে "আগে কহ আর"। কোথায় সেই মনের মানুষ? তখন চিত্তে নির্বেদ এসে ব্যাপ্তিচৈতন্যে চিত্ত প্রসারিত হয়ে শূন্য হয়ে যেতে পারে। কিন্তু চিত্ত পাষাণের মত নীরস হয়ে গেল, রসের উৎস খুললই না এরকম যদি হয়, তাকে কোন মতেই সিদ্ধ অবস্থা বলা চলে না। শূন্য হয়ে পূর্ণও হতে হয়, মূলে গিয়ে রসের উৎসটি ধরতে পারলে, পুরুষ-প্রকৃতির ভালবাসা ও তাথেকে জগৎ-সংসারকে ভালবাসার স্বরূপটি ধরা যায়। এ তো আর কোন ফর্মুলা (formula) করে বোঝা যাবে না, এক রহস্যপূর্ণ অনুভবই তার সন্ধান দেয়। ভালবাসা এক বিপুল যজ্ঞ, তার সাধনাও বড় কঠিন। ঊর্ধ্বমুখী দীপশিখার মত তার গতি হয়েও সব কিছু ভাসিয়ে তা টলমল করে দেয়। বহু রূপের মধ্যে সেই ভালবাসা এলেই তবে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা সার্থক হয়। সেই সোমধারার বর্ষণে এই মর্ত্য জীবও অমৃত হয়ে ওঠে। সে সত্যকে ঐকান্তিকরূপে পেতে হয় বিগ্রহে,

চাই সেই বিবরে; আর তা না হলে জগৎসংসার থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়তে যাই। তা-ও যদি না পেরে উঠি, তখন ভাল মানুষটি হয়ে ধর্মসম্মত এক কল্পিত জীবনে বাঁধা পড়ি। তাতে চারিদিকটা এলোমেলো হয়েই পড়ে থাকে। তার বেশী করণীয় কিছু আছে বলে মনে করতেও পারি না, শেষ পর্যন্ত আর কিছু যেন পেরেও উঠি না। এই ভাবে সাধনজীবন বা যোগকে জীবনের স্রোত থেকে যদি বিচ্ছিন্ন করেই রাখি, সেটা হবে যোগ-সাধনার এক মারাত্মক ত্রুটি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ঋতম্ভরা ও সত্যম্ভরা বাণীতে এবং Mother তাঁর দিব্য জীবনবেদে এই অখণ্ড সমাহারের (Integration) আদর্শ আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন অহেতুক ভালবাসার অপরাজিতা শক্তি দিয়ে, যাতে এই জীবনেই আমরা দিব্য জীবনকে উপলব্ধি করে, তাকে নামিয়ে এনে মনুষ্যজন্ম সার্থক করে, তাতে উন্নীত হতে পারি। সেই মান ও মর্যাদা লাভ না করা পর্যন্ত যোগসাধনার সার্থকতা নেই। দেবতার অমৃতত্ব লাভ করে নরের মহিমা এখানে দেবধর্মকেও অতিক্রম করে যাবে—এই লক্ষ্যটি ধরে অগ্রসর হতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চয় করে ঘোষণা করেছেন অতিমানস শক্তির অবতরণ মানব জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তাঁর এই নির্দেশেই অসম্ভবকে সম্ভবপর করে তুলতে হবে ওই অতিমানসের প্রসাদেই।

যোগ-সাধনায় জীবনে দু'টি শক্তিই সমানভাবে সক্রিয় থাকে—সাধকের দিক থেকে আকৃতি, আর ভগবৎকৃপা বা তাঁর প্রসাদ। মূলে একই ব্রহ্মবস্তুর দু'দিকের গতিবেগ, আকৃতি চায় উত্তরণ আর প্রসাদে ঘটে তার অবতরণ। এই করে দুই-এর অঙ্গাঙ্গিভাবের সহযোগিতায় উচ্চতর মানস ও মানসোত্তর চেতনার ভূমিগুলি সাধকের কাছে অপাবৃত হতে থাকে। উত্তরণের পথে নির্বাণ মুক্তির তুঙ্গতায় এক চরম নেতিতে অস্তিত্বের বিন্দুটুকু হারিয়ে যায়, তা আমরা শুনেছি। বুদ্ধের জীবনে যে নির্বাণ নেমে এসেছিল, তাঁর অনির্বাণ জীবনেই তিনি সে নির্বাণের শক্তি অধিগত করে জগতে তাকে সঞ্চারিত করে

সেই চরম নেতির অনুভবে বোঝা যায় এ জগৎ-সংসার স্বপ্নের মত ঘুমের ঘোরে চলে, এ সত্য নয়। তবুও জগতে জীবনে থাকতে হয় ও তা থেকে কর্ম সম্বন্ধে নানারকম ভাব ও মনের সংস্কার তখন এসে পড়ে। কেউ বলেন প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় করতে হবে, সেটা কেটে গেল "ন পুনরাবর্ততে"। এ সংসারে আর নয়, প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় করে জীবনের মূল বৃন্ত থেকেই সরে পড়া। আর এক দিকের ভাব হল, ওপারে গিয়ে রসবস্তুকে চিনে এসেছি, জেনেছি আনন্দ কি বস্তু। সেই রসেই সব কিছু জারিত দেখছি—"সর্বং খালিদং ব্রহ্ম", তিনিই সব। বৌদ্ধেরা বলেছিলেন শূন্যতাই শেষ কথা—পুদ্গলনৈরাত্মবাদ। আত্মাকেও নেতি করে চরম শূন্যতায় একেবারেই অসৎ হয়ে যাওয়া, কিছুই আর থাকল না। তাই যদি ফিরেও আসতে হয় জাগ্রতে, জগৎ তখন ছায়াবাজির মত থাকে, সে তো শূন্যে অক্ষক্রীড়ার মত দেখা যায়। তাতে তটস্থভাবে আমার থাকা মাত্র, কর্ম থাকে না। এতে জগতের প্রতি যে সুবিচার হয় না, এ তথ্য শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে গোড়া থেকেই আমরা শুনে এসেছি। আবার জগতে থেকে শূন্যতায় সব কিছুকে অনুস্যূত রেখেও যে নির্বাণের কর্ম করা যায়, তাও আমরা এ যুগে প্রত্যক্ষ করেছি মহর্ষি রমণের জীবনে। মরণকে নিয়েই যেন ছিল তাঁর রমণ। তাঁর সমীপে জিজ্ঞাসুরা সেই আকর্ষণে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলেছেন, সেই অভিজ্ঞতার পরিচয় তাঁরা দিয়ে গেছেন। ওদিকে লীলারস আস্বাদন করতে লীলাবাদীরা জগতে থেকেও জগতের কর্মের প্রতি বিমুখ ভাব এনে ধর্মজীবনে শুধু রসে বিভোর হয়ে থাকার জন্য নিজেকে যদি আবদ্ধ করে রাখেন, তাতেও যোগ-সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। কেননা নেতি বা অসৎকে অস্বীকার তাঁর দিব্য লীলারসেই শুধু ডুবে থাকলে সাধনার পূর্ণতা আসবে কি করে? শ্রুতি শুনিয়েছেন, 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন'। ব্রহ্মের আনন্দ জানলে তো কোন কিছুতে ভয় থাকে না, তাহলে অস্বীকার করব কি আর কিসের থেকেই বা ভয় পেয়ে সরে থাকব? তাই

করে তুলতে হয়। সঙ্কর্ষণের যোগশক্তিতে শক্তিকে আকর্ষণ করে গুটিয়ে নিয়ে জানতে হয় তাঁর অভীদ্ধ তপকে, জানতে হয় শক্তির নিমেষকে। আলোকে ধরে আছে যে অন্ধকার সেই রাত্রিকে দুই দিক দিয়েই বুঝতে হবে। এক অন্ধ তমিস্রা থেকে যেমন আমার অজ্ঞান, তেমনি জ্ঞানের আলোকে পেরিয়ে তাকে ঘিরে রয়েছে এক বিরাট অন্ধকারের আলো (Holy Ignorance); আর সেই অ-জ্ঞানই জ্ঞানের প্রসূতি। এই ভাবের ধারণায় অসৎ ব্রহ্ম ও মূল অন্ধতমিস্রা এক হয়ে যায়, তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাকে অবলম্বন করেই জীবনের ঋতি প্রকাশিত। নির্ঋতি থেকে অনৃত ও তা থেকে ঋত আমাদের বোধে আসে। প্রাকৃত জীবনের ক্রমিক অভিব্যক্তিতে এই রীতিই লক্ষ্য করা যায়।

জড় বস্তুতে আমরা দেখি তমোগুণের প্রাধান্য। কিন্তু একটা electron-এর গঠনে যে শক্তিবিন্যাস (Pattern) নিয়মিত হয়েছে, বৃহৎ সৌর জগতের গ্রহ নক্ষত্রের আবর্তনে, এমন কি মানবদেহের জীবকোষে পর্যন্ত সেই নিয়মকে কলিত দেখতে পাই। এক প্রবল শক্তি নির্ঋতির আলো-অন্ধকারের ভিতরে ওই নিয়মের বশী ও প্রেরয়িতা। জড় থেকে প্রাণশক্তি উদ্বোধিত হলে, আমরা সেই প্রবল শক্তিপ্রবাহকে একটা দিক নির্ণয় করে লক্ষ্যাভিমুখে প্রবাহিত দেখতে পেলাম। কিন্তু সে শক্তিপ্রবাহের দুর্দমনীয় বেগ থাকা সত্ত্বেও তার লক্ষ্য তখনও তার কাছে স্থির নয়। তার প্রেরয়িতা ও বশীকে সে চেনে না, এক অজ্ঞাত শক্তিবেগে আপন খেয়ালেই সে শক্তি ছুটে চলেছে। এই ভাবে চলতে চলতে প্রাণশক্তির পরে মনোজ্যোতি এসে পড়েছে, আর জড় প্রাণ মনের ত্রিপুটিতে আবির্ভূত হয়েছে মনু—মননশীল মানব। মানুষের মধ্যে চিন্তাশক্তি জাগ্রত ও পুষ্ট হয়ে আমাদের পরিচিত জগৎকে পরিচালিত করতে চলেছে, এ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই। শক্তির মত্ততায় যারা দাপিয়ে বেড়ায় যাদের বৃত্তিকে আসুরী আখ্যা দেওয়া যায়, তাদেরও ধরে রেখেছে এক বুদ্ধিদীপ্ত মন—

কোন স্তর থেকে, কোন ছিদ্রপথে। তখন এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, প্রকৃতির ওই তিন গুণের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। গুণবিক্ষোভের ফলেই আত্মপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতিতে জট পাকিয়ে উঠেছে। সাংখ্যকার বলেছেন, তুমি যে গুণ দিয়ে জগৎকে গ্রহণ কর, তার অধীন আছ বলেই টলমল করে ওঠ, আর তাতে বিভীষিকা দেখে ভয় পাও। যদি ভয় না পেয়ে অটল থেকে জগৎকে ও আত্ম-প্রকৃতিকে দেখতে শেখ, তাহলেই দেখতে পাবে গলদ কোথায় আর কি করতে হবে। কাজেই গীতার ভাষায় নিস্ত্রৈগুণ্য হতে পারলে গুণাধীন হয়ে প্রমত্ত হতে হবে না। কর্মক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই একটা মৎলবকে মনের সদরে বা অন্দরে স্থান দিয়ে রাখি, আর ঠিক সেই কারণেই সে চাহিদাটা বিধ্বস্ত থাকলে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। ওই মৎলবটির মূলে অনুসন্ধান করলে দেখব আসক্তি বা বাসনার জট পাকানো ছোট বদ্ধ পচা ডোবার মত এক "অংহঃ" সত্তার মধ্যে আটকে রয়েছে। তাই বনে যাই আর আশ্রমে বাস করি, ওই মগ্ন বাসনার অশুদ্ধির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। জন্মের সঙ্গে থেকেই ঐ সংস্কার-গুলি চিত্তকে যেন নাগপাশে বেঁধে রেখেছে, এই রকম বোধে আসে। তাই আঘাতের পর আঘাতে জগৎ-সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা দেখা দেয়, আর আমরা পেতে চাই সাক্ষী দ্রষ্টা পুরুষ খাঁটি মুক্ত আত্মাকে, প্রকৃতির গুণবিক্ষোভের মধ্যে যাতে আর থাকতে না হয়। দুঃখের মূল কারণকে তাহলে এভাবে দেখে পাওয়া গেল, আসক্তি বা বাসনা (desire) আর ক্ষুদ্র অহং (অংহঃ)।

গীতায় আমরা আসক্তি ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্ম করার নির্দেশ পেয়েছি। শ্রীভগবান দেখিয়েছেন জগৎ ও জীবন আছে, থাকবেও। তারই মধ্যে সাবধানে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে যেতে হবে, কর্মত্যাগ করা চলবে না। স্বভাব ও প্রয়োজন অনুসারে নিয়ত কর্ম প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট আছে, সেটা ধরতে পারা যায়, তা আমরা জানি। কিন্তু রুচি অনুসারে অনেকের কর্মে একটা নেশার (hobby) মত একদিকে প্রবণতা দেখা দেয়। সেটা করতে বাধা নেই ; কিন্তু

কর্মফলে যেন মত্ততা না আসে, তাতে সাবধান হতে হবে। আবার মনের মত কর্মফল না হলে নিরুদ্যম হওয়া চলবে না। এক কথায় কর্মে জড়িয়ে পড়তে নেই, আর ওই ছোট অহংগ্রন্থি থেকে মুক্ত হতে হবে। তাঁর হাতের যন্ত্রটি হয়ে অকর্তার ভার রেখে কর্ম করে যেতে হবে। অতীতের চিরকালের সংস্কার যেমন আমাকে তেমনই জগৎ-সংসারকে কর্মপ্রবাহে ঠেলে নিয়ে চলেছে। তাই দুই দিক সামলিয়ে চলতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন আমি করি না, তাঁর কর্ম তিনি করে চলেছেন, এই অকর্তা ভাবনার দৃঢ় ভূমি লাভ করলে এক নিজস্ব শান্তি লাভ করা যায়। আর বাহিরের চাপে কর্ম গ্রহণ করলেও কর্মের মধ্যে শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারব। এই রকম অকর্তার কর্ম চালাতে পারলেই ওই প্রাকৃত অহংটির আড়াল সরে গিয়ে চৈত্যপুরুষকে সামনে পাওয়া যাবে। তাঁকে দেখছি রসস্বরূপে এখন আবার তাঁকেই কর্মের মধ্যে দেখছি অবিচলিত তটস্থরূপে, আর তাতে অকর্তা হয়েও নিস্পৃহ থেকেও যা করবার তাই করে যাই। শ্রীকৃষ্ণকে যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দর্শন করেছি, সব কর্মের নির্দেশ ও প্রেরণা দিয়ে শক্তি যুগিয়েও তিনি যুদ্ধকর্ম নিজ হাতে না করে অর্জুনকে নিমিত্ত করে যুদ্ধ করালেন। সেই রকম প্রশান্তির ভাবকে চরম করে ধরে ঠিক অকর্তা হতে পারলে নৈষ্কর্ম্য যোগেও সিদ্ধি লাভ করা যায়। আবার ভক্তির জোয়ারে সাধকের সত্তা প্লাবিত হতে থাকলেও তাকে ওই প্রশান্তিতে যুক্ত রাখতে হবে। সাধকের দিক থেকে প্রশান্ত ভক্তির ভাবটিই ভাল ও সাধ্য।

গীতার কর্মযোগের অনুসরণ করলে দেখা যাবে, অকর্তা নিমিত্ত মাত্র হয়েও ভগবানের কর্ম করে যেতে হবে। তিনি বলেছেন "মৎ কর্মপরমো ভব"। তাই তাঁর হাতে বীণা করেই বাজান আর যন্ত্রী হয়ে যন্ত্র চালনাই করুন, কর্মে আর কর্মফলে উদ্বেগ থাকবে না। তখন আধারে শান্তি নামে, আর অন্তঃকরণে রস সঞ্চারিত হয়; তাতে কর্মে আনন্দ লাভ হয়ে থাকে। শান্ত আত্মার রসে

ও সুস্থির হওয়া যায়। আবার সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত না হলেও অতিমানস জ্ঞান অবতরণ করতে পারে না, তাঁর দিক থেকে এও এক দ্বিধা। ভগবান নিজেই বলেছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

তাঁর মায়া তাঁরই শক্তিতে পেরিয়ে যেতে হবে এই হল রহস্যের মূল শক্তি। তখন মায়াকে ছাপিয়ে গিয়ে আবার মায়ার অধীশ্বর হয়ে বসতে পারলে তবেই সমস্যার সমাধান হবে।

আত্মাকে কেন্দ্রে রেখেই তো শ্রদ্ধাপূর্বক কর্মযোগের অনুষ্ঠান শুরু করতে হয়। কিন্তু সেখানে অহং ত্যাগ করতে বলা হয়েছে; আমি বা আমার জীবন থাকবে, তবুও আমি বোধটি থাকবে না। কোন বাসনার গাঁট না থাকাতে চাওয়ার কিছু নেই, কোন প্রত্যাশাও রাখতে নেই। এটা সম্ভব হয় চৈত্যসংস্পর্শে, অকর্তার বোধে। তাঁর প্রসাদই যে আমাকে তাঁর দিকে নিয়ে চলেছে, আমি যে তাঁর দ্বারাই বৃত। তিনি চেয়েছেন বলেই না আমি তাঁর কর্মে নিযুক্ত হয়েছি। আমার চিদাকাশে প্রেমসূর্য হয়ে তিনিই তো জ্বলছেন। এই চৈত্য ভালবাসার অবলম্বনটি চাই, তবেই পরিণামে পূর্ণ অতিমানস প্রেমের অবরতরণ সম্ভব হবে। এই ভাবে প্রেমের মধ্যপথ ধরেই শান্ত হয়ে চলতে হবে, শ্রীঅরবিন্দ সেই রকম নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু চলতে হবে অন্তরের গভীরের প্রেরণায়, বাহিরের তাড়নায় নয়। তিনিই মূলে শক্তি জোগান দেন, তা থেকেই অন্তরে প্রেরণা আসে। অনেক সময় গহন কর্মের পথে প্রশ্ন আসে মনে খটকা লাগে। তখন পথের দিশারী গুরুকে মূল শক্তি-নির্বাচনের প্রতিভূ বলে বুঝতে হবে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে স্থির হয়ে ধরে থাকতে হবে। তাঁতে আত্মসমর্পণ করে তাঁর আদেশ নির্বিচারে মেনে চলতে হবে। কর্মপথে তাঁর বশে থেকে চলাই কর্মযোগের ধর্ম। তৈত্তীরিয়োপনিষদে

দেয়। কিন্তু কামপুরুষ প্রবল থাকলে, দুঃখ পেয়ে অসাড় হয়ে গেলেও দুঃখের কারণ আমরা বুঝতে চাই না, বা তা থেকে নিবৃত্ত হতে পারি না। জীবাত্মা (Soul) জাগছে কিন্তু তাতে কামনার মুখোস, আর তার পুঁজি আসক্তি। তাই কামপুরুষের আসক্তির থেকে চাওয়া ভোগের উপকরণ জড় হতে থাকে, উপকরণ বাড়তেও থাকে, কিন্তু দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। এই হল জীবনের প্রাথমিক পর্ব ও জীবনের চাহিদা। এই চাহিদাকে অবলম্বন করে জীবনের অভ্যুদয়কে কিছু পরিমাণে সার্থক করা যায়। কিন্তু আমরা দেখেছি, এরপর আরও কিছু চাই, এই অধ্যাত্ম-তৃষ্ণা থেকেই যোগজীবন শুরু হয়। তাই ভোগ ও ঐশ্বর্যকে প্রকৃতির ধর্ম বলে বিচার করে সাংখ্যদর্শন পুরুষকে তা থেকে বিবিক্ত করার সাধনা দিয়ে দুঃখনিবৃত্তির পথ দেখিয়েছেন। পুরুষ দ্রষ্টা মাত্র হয়ে থাকেন, আর প্রকৃতি ভোক্তা থেকে যান। কিন্তু বৈরাগ্যের পথে চলে এই প্রকৃতি থেকে পুরুষের বিয়োগে পূর্ণযোগ সিদ্ধ হবে না, প্রকৃতি তাতে বাদ পড়ে যায়। তাই প্রকৃতিকে স্বীকার করে নিলে প্রথম কর্তা প্রাণপুরুষ (true vital being), তাঁকে চিনে নিয়ে, তাঁর প্রেরণা ও দোসর জেনে চৈত্য-পুরুষকে ধরতে হবে। তখন গভীরের দিব্যপুরুষ, যিনি অন্তর্যামী পুরুষোত্তম তাঁকেই প্রকৃতির ভর্তা ভোক্তা ও মহেশ্বর বলে জানা দেখা ও পাওয়া যাবে।

প্রাকৃত জীবনে কামময় পুরুষের চাই-চাই খাই-খাই ভাবকে সংহত করে, চাওয়াটা বুঝে নিয়ে ঠিকমত চাইতে পারলে প্রাণময় পুরুষ জেগে ওঠেন। তাঁর জাগরণের অর্থ এককথায় বলতে গেলে জীবনে উল্লাসের স্ফূর্তি। তা থেকেই রস সৃষ্টি—"রসো বৈ সঃ।" সাহিত্য শিল্পকর্ম সঙ্গীত সবই জীবনের উল্লাস থেকে সৃষ্ট হয়, সবেতে তাঁর রসই প্রবাহিত। কাজেই জীবনের ভোগ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার প্রয়োজন নেই তো! কিন্তু সে সবের উপরই ঈশনা থাকা চাই (mastery of circumstances)। সকল রকমের অঘটন ঘটনের মধ্যে জেগে থাকবে শুদ্ধ আত্মার নির্বিকার দ্রষ্টৃত্ব। ভোগের বাধা

রাখতে হবে—কোন ঘটনাতেই জড়িয়ে যেতে নেই। তাই বলে একেবারে নিষ্কর্মা (inert) থাকলে হবে না। অন্তরে যে সংকল্পের আগুন জ্বলেছে; বাহির থেকে তাতে রস জোগান হলে সেটা সহজ ও শোভনভাবে জ্বলতে পারে। তাই সুখদুঃখ প্রিয় অপ্রিয় সব কিছু থেকেই রসটুকু টেনে নিয়ে স্বাদ পেতে হয়—তাতেই চৈত্যপুরুষ জেগে থাকতে পারেন। বাউল গেয়েছেন—

"ত্রিভুবন জুড়ে তাঁর প্রেমের প্রকাশ
পরমা প্রকৃতি সেই প্রেমেতে উদাস
অন্তরে বাহিরে প্রেম, প্রেম ঘরে ঘরে
ভোগে প্রেম যোগে প্রেম রোগে প্রেম ঝরে।"

শুদ্ধ প্রাণময় পুরুষটি এই ভাবেই তখন জেগে থাকেন, আর তাতেই হয় সত্যকার জীবনের স্বীকৃতি। তাহলে দেখছি, সাধনার ফলে আসক্তির ত্যাগ ও অহংএর নিবৃত্তি হয়ে গেলে এই আমিই তাঁর হয়ে যাবে। তাতে সুখদুঃখের আঘাতে বিরহমিলনের দোলায় শুধু যে অটুট থাকতে পারব, তা নয়, তা থেকে প্রাণপুরুষ রস আহরণ করে নেবে। জীবন হয়ে উঠবে "স্বাদু স্বাদু পদে পদে"।

শিশুর মত সহজ ও সরল থেকে মনন করার ফলে আসবে ভাব; রামকৃষ্ণদেবের জীবনে সেই বালক-স্বভাব আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বিবেকানন্দ ধ্যানী ও প্রচণ্ড কর্মী ছিলেন, কিন্তু শেষের দিকে একটি বালকের ভাব তাঁকে পেয়ে বসেছিল। তিনি আকুল হয়ে থাকতেন, "কখন তুমি ডাকবে?" এই সিদ্ধ অবস্থাতেও কিন্তু পূর্ণযোগের লক্ষ্য হল আরও এগিয়ে চলা। কেননা এরও পরে আছে প্রকৃতির ঐশ্বর্যের দিক, শক্তির অক্ষয় সৌন্দর্যের ধারা। তাতে পুরুষ-প্রকৃতির মিলিত ছন্দে কৈশোরলীলা চলতে থাকে। চৈত্যসত্তার জাগৃতি ঘটলে তাঁর আপনজন পরাপ্রকৃতিও সামনে এগিয়ে আসেন। এই

প্রকৃতি জীবভূত তাঁরই সনাতন অংশ—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। তিনিই চৈত্যের দিশারী। শৈশবে তো ঐ দিশারীর দিশায়ই চলে ছিলাম, কিন্তু কে চালিয়েছে তাকে দেখিনি, জানিওনি। দিব্য চক্ষু খুলে গেলে তবে তো তাঁকে দেখতে পাব। সে সময় বোধির ভূমি লাভ করলে পরে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি (Pure Reason) ধীরে ধীরে স্ফুরিত হয়ে রজ তম এই দুই-এর মিশ্রণ থেকে মুক্ত হয়ে বোধির সঙ্গে শুদ্ধভাবে মিলিত হতে পারে। তখনই বুদ্ধির ভূমিও সবটাই উজ্জ্বল ও অগ্র্যা হয়ে ওঠে। এই ভূমি লাভ করলে সাধনায় সাবালকত্বের বোধ (maturity of the soul) আসে। তখন আর পদে পদে বিচার করে চলতে হয় না। প্রতিভ-সংবিৎ আবির্ভূত হতে থাকে আর শুদ্ধ বুদ্ধি প্রতিভাত হয়। বিবেকজ জ্ঞান স্পষ্ট হয়। অন্তর থেকে অন্তর্যামীর চালনা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-সংবিতের ভিতর দিয়ে ধরা পড়ে। এই অবস্থার কথাতেই রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন যে কিছুকাল সাধনা করলে পরে শুদ্ধমনই গুরু হয়। এ তো আর তর্ক বিচারে বোধগম্য হবেনা, শিশুর মত এক সবিশ্বাস জ্ঞান নিশ্চিতরূপে প্রতিভাত হয়। উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, ছোট মেয়েটি বলছে যে কাল আমার দাদা আসবে। এ বলা কোন কিছুকে না জড়িয়ে কোন স্মৃতি অবলম্বন করে কিন্তু নয়, এ তার সিদ্ধ দর্শন। সেটা ফলবেই। সিদ্ধেরা যেটা ফলবে, সেটা বলেন। তাঁদের মনে মিথ্যা জাগতেই পারে না। ভবভূতি বলেছিলেন, "তখন বাককে অর্থ অনুসরণ করে।" বাকের সেই শক্তি আছে। কোন মতলব না রেখে দেখতে শিখলে ওই 'কন্যা কথয়তি…"-এর মত সত্য সরলভাবে বাক্ উচ্চারিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই কথাই বলেছেন যে, সাধনা তখন করতে হয়না, তিনিই হাত ধরে নিয়ে যান।

এরপরে আরও গভীরে গেলে যাঁকে দেখা যাবে, তিনি হলেন অন্তর্যামী পুরুষ। পৃথিবীর অন্তরে থেকে তিনি তাকে ঘোরাচ্ছেন কিন্তু পৃথিবী তাঁকে

জীবনের কূলে কূলে এসে উচ্ছলিত হয়ে পড়ছে, তাকে গ্রহণ করাও সেই মহান্ সিদ্ধজীবনের দায়। শিবের মত নীলকণ্ঠ হয়ে, মন্থন-জাত হলাহলকেও অমৃতের শক্তিতে গ্রহণ করতে হবে, তবেই পূর্ণতা। তিনি যেমন বিশ্বের সঙ্গে, পূর্ণযোগীকে বিশ্বব্যাপারে সেই রকমটিই হতে হয়। এইভাবে অতিমানস-যোগে ব্যক্তি বিশ্ব ও বিশ্বোত্তীর্ণ লোকোত্তর—তিনটি অবস্থাকে একসঙ্গে নিয়ে পূর্ণ হয়ে পূর্ণযোগে চলতে হবে। অতিমানসের শক্তিসম্পাত ছাড়া তাই এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। অধ্যাত্ম-সাধনার শৈশব কৈশোর পেরিয়ে নিত্য তারুণ্যের টলমলে দুর্বার শক্তি নিয়ে অতিমানসের ত্রি-পর্বা রূপান্তর ঘটিয়ে যিনি পৌছবেন, তিনিই হিরণ্ময় বিজ্ঞান-ঘন পুরুষ (Guostic Being) তিনি বিষ্ণুচৈতন্য তিনি যুবা, অতিমানস স্বরূপ শক্তির যুগনদ্ধ পুরুষ তিনিই। তাঁর সাবিত্রী শক্তির অবন্ধ্য প্রচোদনার জ্যোতিঃশক্তি ছড়িয়ে পড়বে পার্থিব জীবনের পরে, বিদ্ধ হবে তার মর্মমূলে,—দিব্যজীবনের ভাস্বর মহিমায় ঘটাবে তার রূপান্তর।

অতিমানস রূপান্তর লক্ষ্যে রেখে বিজ্ঞান-ঘন পুরুষের মহিমা ও প্রাপ্তি পর্যন্ত আমরা যজ্ঞকর্মের প্রসঙ্গে আলোচনা করে দেখলাম। এই চরম অবস্থার পরম প্রাপ্তিতে প্রজ্ঞা প্রাণ ও প্রেমের মিলিত সমর্থ কর্মের সার্থকতা। ওই অবস্থা মনে রেখে কর্মযোগে হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হবে। বিজ্ঞান-ঘন চেতনা লোকোত্তরে প্রতিষ্ঠিত থেকেই লোকায়ত হয়ে প্রাকৃত চেতনাকে আপন স্বভাবে রূপান্তরিত করবে, তাতেই পার্থিব জীবনের সিদ্ধি। অহংটিকে সমূলে উপড়ে ফেলে বাসনার ভারমুক্ত হয়ে সমর্পিত হয়ে চলা শুরু করেছি। শুধু নিজকে খুলে দিতে দিতে তাঁর কাছে লুটিয়ে পড়া—এইভাবে কর্মযোগের পূর্ণাহুতিতে ষোড়শকল সৌম্যপুরুষ এসে দাঁড়াবেন ষোড়শী তনুতে—তা-ই পূর্ণতা।

নিয়েই অনন্ত-স্বরূপের প্রেমে অবগাহন করতে হয়, গলে যেতে হয়। এই ভাবে প্রেম ও জ্ঞান নিয়ে যে কর্ম তাতে বিশ্ব সমাজ আত্মীয় পরিজন কেউ তো বাদ পড়তে পারে না। কৈশোরের পরিপাকে আসে তারুণ্যের বল, আর তখনই জীবনে বীর যোদ্ধার ভূমিকা দৃঢ় হয়। জ্ঞানের ও প্রেমের বীর্যে কর্মের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খুঁটিনাটি পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয় সমগ্রের ব্যাপ্তিতে ও চৈতন্যে। তাই জীবনের কুরুক্ষেত্রে সাধকের আচরণের আদর্শ হল সদাচার কিনা সত্যের আচরণ, আর বিশ্বের অন্তর্যামীর স্বতন্ত্র প্রশাসনেই তার স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা।

বিচার ও আচারে সমস্যা দেখা দেয় অহংকে কেন্দ্র করেই। যতই সাধক জ্ঞানের উর্ধ্বভূমিতে আরোহণ করতে থাকে, ততই তার দৃষ্টি প্রসারিত হয়। তার কর্মেও যে জ্ঞান ও শক্তি স্ফুরিত হয়ে চলেছে, তাও সে উপলব্ধি করে। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন যে তাঁকে জানলে বেতালে পা পড়ে না। কিন্তু তবুও কর্মজীবনে নামতে গেলে কতবারই তালভঙ্গ হয়, ঠেকে শিখতে হয়। কেন না মানুষের মধ্যে সুখদুঃখের দ্বৈতবোধ থাকেই ; শ্রেয় ও প্রেয়ের সংস্কার থেকে যা ভাল লাগে না, বা যা শ্রেয় বোধ হয় না, তাতে বিরক্তি আসে। এই ভাললাগা বা না লাগার দ্বন্দ্ব, একটা শিশুরও আছে। প্রথম দ্বন্দ্বই হল জীবন-বোধের দ্বৈত, বুদ্ধির ক্ষেত্রের বিচারণা থেকে বেছে নিতে হয় অশুভ থেকে শুভ, পাপ থেকে পুণ্য, প্রেয় থেকে শ্রেয়। দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব দেখা দেয় অনুভবের দিক দিয়ে, কোনটা ভাল লাগে, কোনটা লাগে না, কোনটা প্রিয় কোনটা অপ্রিয় বোধ হয়। মনস্তত্ত্বের এই সব সমস্যা খুব গভীর এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সদাচার পালনে অনেক বাধা উপস্থিত হয়। জীবনের রীতি নীতি ও প্রীতি বিড়ম্বিত হয় তখনই, যখন দেখা যায় যেটা কল্যাণকর তাকে বিমথিত করে যে বিরুদ্ধ শক্তি, সেই অন্যায় সেই প্রবঞ্চনার নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে হচ্ছে। এই অবস্থায় কর্তব্য কর্ম কোনটা হবে, তা নিয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়তেও হয়। কেন না বাহিরের দিক থেকে সমাজবদ্ধ মানুষের চেতনা বনের বাঘের চেয়ে উন্নত

ব্যক্তি ও সমাজ দুই-ই অন্যোন্যনির্ভর। যুগে যুগে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কখনও ব্যক্তিতন্ত্র কখনও সমাজ-তন্ত্র একটাকে গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়ে থাকে। সমাজই ব্যক্তিকে লালন ও পালন করে কিন্তু সমাজকে বেগবান করে ব্যক্তির উদ্বুদ্ধ চেতনা। এ যুগে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবাদ আর সমাজতন্ত্রবাদ এই দুটি মূল ধারণা নিয়ে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। কেননা এখনও এ বিষয়ে দ্বৈত ও দ্বন্দ্ব রয়েছে মানুষের বুদ্ধিতে মানুষের মনে। সমাজতন্ত্রীর মতে ব্যক্তি সমাজদেহের একটি কোষ মাত্র। সমাজের দায়িত্বে নিজের সত্তাকে মিলিয়ে স্ফুরিত করতে হবে ব্যক্তিতে। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চান ব্যক্তির জন্যই সমাজ। শিশুকে যেমন বড় করতে গেলে তার স্বভাব ও স্বধর্মকে পুষ্ট করার সুযোগ দিতে হবে, তাতেই সে নিজকে ছাপিয়ে বড় হতে পারবে। কিন্তু তার ওপর শুধু দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে তার স্বাতন্ত্র্য যদি রক্ষা করা না যায়, তাহলে তার স্বাভাবিক পুষ্টি ব্যাহত হবে। ব্যক্তিকে পূর্ণ বিকশিত করে তোলাই সমাজের পরম পুরুষার্থ। কিন্তু ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রবল হতে দিলে তখন ব্যক্তিতন্ত্রে সমাজতন্ত্রে আবার বিরোধ বেধে যাবে। কাজেই মারামারি লাঠালাঠি বাদবিসম্বাদ বেড়েই চলবে, দুই মতের বিরোধে সমস্যার সমাধান হবে না। তাই দুদিক দিয়েই বিচার করে সমগ্র মানব-জীবনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে যে ব্যক্তি ও সমাজ দুইয়ের মধ্যে চৈতন্যের স্ফুরণই হল প্রকৃতির লক্ষ্য। ব্যক্তি ও সমাজের ঊর্ধ্বে তাদের ধরে রেখেছে সেই চৈতন্য এবং তার স্ফুরতার একটা ক্রম আছে। দেহের চেয়ে প্রাণে বেশী স্ফূর্তি, তার চেয়ে বেশী মনে, আর তার চেয়েও বেশী আত্মবোধে। তখন ব্যষ্টি আর সমষ্টি, ব্যক্তি আর সমাজে ভেদ-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য সমষ্টিতে প্রসারিত হয়ে বিশ্বব্যাপ্ত ও সব ছাপিয়ে লোকোত্তর বৃহৎ অনন্তের স্ফুলিঙ্গ; কাজেই যেমন জনগণের প্রতি সমাজের প্রতি তেমনি বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে তার প্রাণের দাবী। সে সবের প্রতিই দায়িত্ব আছে। এদেশের ধর্মশাস্ত্রে মানুষকে পিতৃঋণ ঋষিঋণ দেবঋণ সব

পরিশোধ করার নীতি গ্রহণ করে চলার বিধান দেওয়া হত। সমাজে থেকেই দেহ-প্রাণ-মনের ভূমির ভিতর দিয়ে চৈতন্যের ক্রমিক প্রসার ঘটিয়ে আত্ম-চৈতন্যের বিশ্বময় ব্যাপ্তিতে উত্তীর্ণ হওয়া প্রকৃতি-পরিণামের নিগূঢ় লক্ষ্য। সমাজ-ধাত্রী ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এইভাবে পুষ্ট করে তুলবে আর ব্যক্তিও যা পেয়েছে তার দশগুণ সমাজের পুষ্টির জন্য দিয়ে দেবে, যজ্ঞ-ভাবনায় ত্যাগ করবে। "মদাত্মা সর্বভূতাত্মা"—এই উদার বোধে ব্যক্তি আর সমাজের দায় একাকার হয়ে যায়। এই দৃষ্টি দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়েছেন যে ব্যক্তিই হল সমাজের পথিকৃৎ—সমষ্টির চোখে সে-ই আলো জ্বেলে দেয়, দৃষ্টি দান করে। Individual consciousnessকে তিনি বলেছেন Cosmic consciousness-র spearhead। এ খুব গভীর কথা, আর সেখানেই ব্যক্তির স্বাতন্ত্রবোধের সার্থকতা।

আমি বা আমার বোধ নিয়েই মানুষের মধ্যে চৈতন্যের অভিব্যক্তি সূচিত হয়। আমি আছি এই বোধই সর্বাপেক্ষা প্রবল। আর কিছু চৈতন্য আছে কিনা জানি না, আমার বোধে যা কিছু আসছে ভাসছে উদ্ভাসিত হচ্ছে, তা থেকেই আমার জ্ঞান। শিশু জন্মগ্রহণ করে একটি অতি সুকুমার নমনীয় কাঠামো নিয়ে। তার পরিবেশ থেকে লোকাচার দেশাচার স্ত্রী-আচার ইত্যাদি অনেক রকম আচরণ সেই কাঠামোতে অনেক সংস্কারের ছাপ ফেলে। সে যদি একটা সদাচারের নিয়ম না পায় তাহলে তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে না, বিশৃঙ্খল হয়ে থাকলে কোন কিছুই দানা বাঁধতে পারে না। এ জন্য একটা শৃঙ্খলা চাই, একটা ছন্দ চাই। কিন্তু একটা যান্ত্রিক নিয়মের ভার যদি আবার তার' পরে শুধু চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না, তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় সে সমাজের ভিতর থাকলে দুষ্ট ক্ষতের মত আচরণ করবে, না হলে সমাজত্যাগী হয়ে অনধিকারী সন্ন্যাসী হতে চাইবে। কোন পথেই তার আত্মবিকাশ পূর্ণ হতে পারবে না। একটা

হয়। সে ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি বা নেতাকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সেই ব্যক্তির চৈতন্যে বিশ্বচৈতন্য প্রভাসিত হয়। রামকৃষ্ণদেব তাঁর বাণী ও স্পর্শ দিয়ে যেমন 'চৈতন্য হোক' বলে জনে জনে চেতনার আলো জ্বেলে দিয়েছিলেন ফুল ফোটানোর মত করে। সেইরকম করে প্রতিটি ব্যক্তি-চৈতন্য প্রবুদ্ধ হয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মহান নেতাকে অনুসরণ করবে। তা যখন সম্ভব হবে তখন আচ্ছন্ন মূঢ় ও ঘোর গণচেতনা অন্ধ তামস থেকে আলোয় উত্তীর্ণ হবে। সেখানে ছলনা জুয়োচুরি রেষারেষির স্থান কোথায়? ভারতের ধর্মপ্রবক্তাগণ তাই সমস্যার সমাধান করেছেন এই ভাবেই। প্রতিটি জীবকে অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোয় তুলে নিয়ে প্রবুদ্ধ মানবসমাজ গড়ে উঠবে। মহামানব যখন জাতির পুরোধা হয়ে আসেন, তখন তিনি বর্ষা-ফলকের মত সুতীক্ষ্ণ তাঁর ক্রান্তদৃষ্টি ও মনীষা দিয়ে দীর্ঘকালের সঞ্চিত অজ্ঞানের আবরণ বিদীর্ণ করে বিশ্বের উর্ধ্বগতিকে নিয়ন্ত্রিত করেন, অজ্ঞানের চাপে তাকে একেবারে তলিয়ে যেতে দেন না। মানব জাতির সমগ্র চৈতন্যের 'পরে সেই তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়ের আলোর ছটা সমাজ-চেতনাকে এক স্থায়ী দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই সমষ্টি-চৈতন্যকে মান দিতে গেলে প্রতিটি ব্যষ্টিকে চৈতন্যের ঐ ভূমিতে তুলে নিয়ে যাবার কথা চিন্তা করতে হবে। তখন সকলের মুক্তি হলে তো কথাই নেই। ভবিষ্যতের সেই উজ্জ্বল স্বপ্নকে রূপায়িত করতে অপ্রবুদ্ধ সমষ্টিকে ব্যষ্টি-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, আর তাই হবে অতিমানস শক্তির অবতরণের ভূমিকা। একজন প্রবর্ত পুরুষও যদি সেই শক্তির ধারক ও বাহক হয়ে তাকে নামিয়ে আনতে পারেন, সর্বমানব বা সমগ্র মানবজাতি তাতে ক্রমে উন্নীত হতে পারবে। প্রতিটি ব্যক্তি-চৈতন্যে তার ক্রিয়া হবে। তাই মহাপুরুষ তাঁর সাধনার সিদ্ধিতে যখন এইভাবে শক্তি-সঞ্চার করে দিয়ে যান, তখনই সমষ্টিচেতনা সেটা সচেতন ভাবে গ্রহণ করতে সমর্থ হয় না। কিন্তু প্রতিটি আধারে চেতনার সব স্তরেই তার শক্তি স্ফুরিত হতে থাকে,

বিচার শুদ্ধির প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, এই রকম নির্দেশ যেমন থাকে ; সে শুদ্ধীকরণের প্রয়োজন শুধু মাত্র মন ও বুদ্ধির স্তরে আবদ্ধ থাকে না। পাপ ও পুণ্য, দয়া ও নিষ্ঠুরতা, ধর্ম ও অধর্ম এইভাবে সাজিয়ে সব সময় তার বিচার করা চলে না। শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ সর্বদাই এই সব সমস্যার সমাধানে অধ্যাত্মবোধের সমগ্র ভূমি উদ্ভাসিত করে দিয়েছে। মানসিক শিক্ষা ও আদর্শ নৈতিক আচরণে মানুষের চেতনার শুদ্ধি সম্পূর্ণ হতে পারে না। আচারের ভাল-মন্দ নিশ্চয় আছে, কিন্তু সে ভাল-মন্দ বিচার করতে হবে পরমার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে। যাতে দিব্যচেতনার উন্মেষ হয় তাই ভাল, আর যাতে সেটা বাধা পায় তাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। একেবারে চরমে না পৌছানো পর্যন্ত একটা দ্বন্দ্ব থাকেই। অবশেষে লোকোত্তরে উত্তীর্ণ হয়ে উদাসীন ভূমিতে দাঁড়িয়ে দ্বন্দ্বাতীত হতে হবে। সে অবস্থায় "ন পুণ্যং পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং....", আর তখনই দ্বৈতের মালিন্য থেকে মুক্তির কৌশল আয়ত্ত হবে। এর অর্থ এ নয় যে বেপরোয়া পাপাচরণের অপরাধ রইল না। পুণ্য দিয়েই পাপাচরণকে নির্জিত করতে করতে এগিয়ে যেতে হয় ও তারপরে বিজয় সম্পূর্ণ করতে পুণ্যের সংস্কারও বর্জন করতে হবে। এই শিবচেতনায় অধিষ্ঠিত হতে না পারলে রাষ্ট্রনেতা বা সমাজের নেতাও মানুষের পথ প্রদর্শক হয়ে তাকে আলোর পথে নিতে পারবেন না। উপনিষদের মধ্যে আমরা বহু আখ্যান পেয়েছি যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান লাভ করেও ঋষি নেমে এসেছেন ক্ষত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ রাজার কাছে, জগৎজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য। আচরণের চতুর্থ ভূমিতে এই আদর্শ রাখা হয়েছে। চেতনা সেখানে স্বচ্ছ, সর্বভূতাধিবাস কর্মাধ্যক্ষের প্রশাসনে সমর্পিত হয়ে ব্যক্তি তার স্বভাব ও স্বচ্ছন্দ অনুযায়ী আচরণ করে তার কর্মে। যোগের ভাষায় সে হয় "ধর্মমেঘ"—অর্থাৎ যা সে ঢেলে দেয় তাই ধর্ম, সেখানে অধর্মের আভাসটুকুও থাকে না। কিন্তু সে ধর্মকে কোনও লোকধর্মের

ভ্রূণ অবস্থায় রয়েছে, প্রকৃতির মধ্যে চৈত্যসত্তা বীজভাবে নিহিত রয়েছে এইভাবেই। তাই শুষ্ক কাঠের মত দেহপ্রাণ মন সবটাই অগ্নিঘাত্ত হয়ে প্রজ্বল হয়ে উঠবে ভর্গজ্যোতিতে। প্রেম দিয়ে জ্ঞান দিয়ে শক্তি দিয়ে সেই অগ্নি-সত্তার বীজকে অঙ্কুরিত করে, সমগ্র সত্তাব্যাপী চিদগ্নিময় বোধকে বহন করে চলতে হবে। এই হল চিন্ময়প্রত্যক্ষবাদ ; এতে প্রয়োজন হলে অনেক কিছু বিনাশ করতেও হবে। তখন পাপপুণ্যের দ্বন্দ্ব পেরিয়ে পৌঁছাতে হয় চরম সত্তার মহিমাতে। সেখানে দ্বৈতবোধ নেই, কাজেই ঘৃণাও নেই। সেই অদ্বৈতবোধ থেকে দ্বৈত ও তা থেকে বহুকে নিয়ে আচরণ করবার শক্তি পূর্ণ হয়। সে আচরণে অনেক সময় আঁকা বাঁকা পথে চলে শঠের সঙ্গে শাঠ্য ও স্পর্ধিতের প্রতি বিদ্রোহ করে চলতে হয়। কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধনের সঙ্গেও যুদ্ধ চালাতে তাঁরই হাতের যন্ত্র নিমিত্তমাত্র হয়ে যেতে হয়। সেখানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বুদ্ধির চালক ও সারথি হয়েও দুর্যোধনের বুদ্ধি-বৃত্তির সাক্ষীও তো তিনি ; "ময়ৈব নিহতা পূর্বমেব"—তাঁর হাতে পূর্বেই নিহত হয়ে আছে তারা সব।

অতিমানসের নীতিধর্ম (Supramental ethics) বুঝতে আমাদের গীতার ওই যোগকৌশল কর্মে প্রয়োগ করতে হবে। আজকের দিনেও কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে পাপপুণ্যের দোলায় বারবার নামতে হয়, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে কালাগ্নি রুদ্রের চরণে আহুতি দিতে হয় জীবনের সব-কিছু অশিবকে নির্মম হয়ে। তখন সেই জীবন ও মরণের দ্বৈতকে পেরিয়ে অমৃতকে ছিনিয়ে আনার বীর্য লাভ হবে। সেখানে শিব এবং কেবলম্—সেই এক জগদীশ্বর, আর তার বিভূতি হল এই জগৎ। কাজেই কি ব্যক্তি কি সমাজ কি রাষ্ট্র, সকলেরই চালক তিনি। আমার কর্তব্য কর্ম ধর্ম সদাচার পরস্পর-বিরোধী সমস্যাসঙ্কুল হয়ে দেখা দিলেও তখন বুঝতে পারব অন্তর্যামীর পরিচালনা।

১৬

ব্রহ্ম-সঙ্কল্প—ত্রিগুণা প্রকৃতি

কর্মযোগের প্রসঙ্গে দেখলাম, দিব্যসঙ্কল্পকে জীবনের কর্মে ধরতে হবে এবং তা থেকে দিব্যকর্ম সংঘটিত হবে আর সাধকের হবে দিব্যজন্ম। কিন্তু সেই ব্রহ্ম-সঙ্কল্পকে জীবনের কর্মে ধরা তো সহজ কথা নয়। নিষ্কাম কর্ম আরম্ভ করে ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হয়েও পদে পদে ধরা পড়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার (Supreme Will) সঙ্গে আমার ইচ্ছার বিরোধ কতখানি। কত অনুতাপ ক্ষোভ বিবেক-দংশন ইত্যাদিতে ক্ষতবিক্ষত হয়েও এই মলিন আমির আবরণটি খসতে চায় না। তাই গীতার উপদেশ মত অকর্তার ভাব নিয়ে চলতে পারলে ইচ্ছার দ্বৈতবোধ থেকে মুক্তি ঘটে। আমার আমিকে সমূলে বিনষ্ট করে কর্মে অকর্ম আর অকর্মে কর্ম, এই রকম করে যে দেখতে শিখেছে, সেই হল কৃৎস্নকর্মকৃৎ। আর এই হল কর্মের মূলে কর্মকর্তার যে সমগ্রবোধ (total view)—তাই। গীতায় এই কর্মের পরিণত ভাবটি নিজের মধ্যে দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—"ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন···ইত্যাদি। তিনলোকে আমার কর্তব্য বা করার মত কিছু নেই।" তবুও কর্ম করছি, না হলে কর্ম লোপ পেয়ে, জীব উৎসন্নে যাবে—"উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ। ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্···" কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উপস্থিত থেকে ভগবান তাই অকর্তার কর্ম করে দেখালেন। যাতে যুদ্ধ না ঘটে, সে চেষ্টাও করলেন; তারপর যুদ্ধ ঘটিয়ে অর্জুনকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করলেন। এ থেকে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লাভ করা যায়। তিনি অর্জুনকে দেখিয়ে দিলেন যে প্রকৃতিই সব কিছু করে চলেছেন, তোমার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে যে বিপুল কর্মতরঙ্গ, তা দিয়েই প্রকৃতি কর্ম করিয়ে নেবেন। এইভাবে দেখতে শিখলে ও পরে অহংকে সরাতে পারলে নিষ্কাম কর্মের অভ্যাস

করে। যোগকর্ম শুরু করে সাধক দেখতে শেখে যে অহং সরে যায়, তাকে সরে যেতেই হয়। গভীরে তার সর্বাবগাহী দৃষ্টির নির্দেশে কর্ম হয়ে চলে—অকর্তার কর্ম। তা থেকে সহসা ভগবৎপ্রসাদ বা তাঁর অনুগ্রহশক্তির অবতরণে দিব্যকর্ম সম্ভাবিত হয়। কাঁচা আমিটি সমূলে বিনিষ্ট হওয়া সহজ হয় না, অগণিত তার সংস্কার অভ্যাস ও ধর্মাধর্মবোধের নিগড়; কত সূক্ষ্মভাবেই যে তার মৎলব ভগবৎ-ইচ্ছার রূপ ধরে তাকে বিড়ম্বিত করে, তা আর বলার নয়। ওই বিদ্যুৎ ঝলকের মত অনুগ্রহশক্তি বা ভগবৎ-প্রসাদের অবতরণ যখন যন্ত্রটির ধাতুবদল পর্যন্ত করে দেয়, তখনই আত্মমহিমার বোধ আসে, না হলে কিছুতেই কিছু হয় না। তখন নিজের ওই কাঁচা অহংটিকে নিজেই আর সহ্য করা যায় না। কবির ভাষায়—

"এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে
হবে গো এইবার—
আমার এই মলিন অহঙ্কার।
দিনের কাজে ধূলা লাগি
অনেক দাগে হল দাগি
এমন তপ্ত হয়ে আছে
সহ্য করা ভার।
আমার এই মলিন অহঙ্কার।

আমার সব কর্মের মাঝে ওই মলিন প্রতপ্ত অহঙ্কার এসে যে তাপ সৃষ্টি করে, তাতে তাঁর সঙ্গে আমার আড়াল আর ঘুচতে চায় না। যখন আমি নিজেই তাকে সইতে পারি না, আর তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার জন্য অন্তরের ব্যাকুলতা উদ্বেল হয়ে ওঠে, তখনই সত্যকার সমর্পণ শুরু হয়। প্রাণে আশা জাগে যে তাঁর আসার সময় হল, এবার তাঁর সঙ্গে মিলনের লগ্নে মলিন বস্ত্রটি পরিত্যাগ করে স্নান করে প্রেমের বসন পরে শুচি শুদ্ধ হতে হবে। তাঁর

প্রসাদই যে আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছে, সেটা প্রত্যক্ষ করা যায় তাঁর ওই অনুগ্রহ-শক্তির অবতরণেই (Divine Intervention)।

কিন্তু ওই মলিন ও প্রতপ্ত অহংটিকে একেবারে পরিত্যাগ করতে পারা সহজসাধ্য নয়। কর্ম সিদ্ধ হলে কর্মফলের ক্রিয়ায় সূক্ষ্ম অহংবোধ এমনভাবে গর্বে ফুলে থাকে যে সেটা ধরতে পারা সহজ হয় না, সেজন্য গীতা বলেছেন সুখেও বিগতস্পৃহ হওয়ার কথা। অহং ফুলতে ফুলতে অতিকায় হয়ে বেলুনের মত ফেটে পড়ে বা চুপসে যায়, সে ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু তাতে জীবনে ও সাধনে অনেক দেরী হয়ে যায়। আবার কর্মফলে যদি সিদ্ধি না আসে, তাতে ঐ মলিন অহঙ্কারকে আর জমতে দিলাম না, সার্থকতা থেকে দূরেই আছি। তবুও মনের মধ্যে গভীরে আছে প্রশান্তি—প্রসাদমধিগচ্ছতি"। চিত্ত প্রসন্ন থাকলে এই ভাবের পরিপাকে সত্যকার প্রেমের আবির্ভাব হয়। শ্রীঅরবিন্দ এইভাবে দেখিয়েছেন যে সত্য (Truth) আর প্রেম (Love) মূলত একই বস্তু। পুরুষসত্তা শান্ত আকাশবৎ, তাতেই প্রেমরূপে তাঁর প্রকৃতি ফুটে উঠছেন, আবার তাতেই মিলিয়ে আছেন। তাই কর্ম করার ফলে যে চিত্তের প্রসন্নতা, সেটা দিনের বেলাকার প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কর্ম সম্পন্ন করে কর্ম অন্তে সন্ধ্যাবেলায় কোন দাগ বা মলিন ছাপ রেখে গেল না। যখন মিলনের লগ্ন এল তখন সব ভার হাল্কা হয়ে গিয়ে চিত্ত ভরে উঠল প্রসাদে, তাঁর প্রেমে। এ তো তাঁরই শক্তি হয়ে যাবার (নিমিত্ত) পরিণাম। মীরাবাঈ গেয়ে উঠেছিলেন "মহাঁনে চাকর রাখো জী।" অষ্টপ্রহর তাঁর দাস হয়ে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে, দেহ প্রাণ মন সব ভেঙে মথিত হয়ে যেন নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে। তবুও সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজকে একেবারে রিক্ত করে শূন্য করে দিচ্ছি তাঁরই কর্মে, কেন না এ তো তাঁরই ইচ্ছা। তাঁর সর্বনাশা দৃষ্টিই এই রকম করে নিঃশেষে শূন্য করে উজাড় করে নেবে আমার সব শক্তিকে তাঁর সর্বশক্তিমত্তায়, আর তখনই সেই মহাশূন্যবৎ পরমব্যোমে হবে চৈতন্যের

চলে।" এই আগুন হয়ে জ্বলাই হল পরিপূর্ণ জীবন; সিদ্ধের বা কামালের জীবন। জীবনের যেটা স্থিতি বা আসন, তার বাহিরের দিক ভিতরের সত্যকে বহন ও লালন করে বলেই তার সার্থকতা। তাই সত্যকে লাভ করলে যে অবস্থায় যে ভাবেই থাকা যায়, তাই হল জীবনের সহজ স্থিতি—তাঁরই সঙ্গে তাঁর লোকে সর্বদা অবস্থান করা। আর যে কর্মই তখন আসে, তাকে সহজে গ্রহণ করে স্বধর্ম পালন করা যায়। ধর্মাধর্ম রক্ষা করা বা সদাচার পালন করা, সে সবের মধ্যেই আছে তপস্যার যোগ। কিন্তু সে সব সহজ ও ভাস্বর হয়ে উঠবে পূর্ণযোগের সিদ্ধ সাধকের জীবনে, আর সেই জীবন হবে ব্রহ্মসঙ্কল্পের মূর্তিমান বিগ্রহ। সে যোগী যে ভাবেই বাস করুন বা যে কর্মই করুন তিনি পরম সত্যেই স্থিত থাকেন, এই কথা শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন—"সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে।"

এখন প্রশ্ন ওঠে, ব্রহ্মসঙ্কল্পকে জীবনে ধরা যাবে কেমন করে? সেই সত্যে বর্তমান থাকার অর্থ কি? প্রথমে দেখতে হবে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে তাঁর ইচ্ছা অনুস্যূত হয়ে আছে বলে কর্মে রূপ ধরছে সেই সত্যসঙ্কল্প। সেই ইচ্ছার সঙ্গে যোগ রেখে চললে বুঝতে পারব, তাঁর কর্মই সম্পাদিত হয়ে চলেছে, কর্ম আমার নয়। তাই সমতা ও অহং-বর্জনকে (annihilation of ego) কর্মযোগের প্রাথমিক ও প্রধান ভূমিকা রূপে আমরা গ্রহণ করেছি। ঐ কাঁচা আমিটা না থাকলেই বেশ একটা শূন্যতার বোধ আসে, চিত্তে এক ফাঁকা ভাব। শূন্য ডালির মত সত্তাটা শুধু তাঁর পায়ের কাছে পড়ে আছে; আর তখন তাঁর ইচ্ছার প্রকাশই শুধু পারে সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করে আবার বহিয়ে দিতে। তৎক্ষণাৎ প্রতিভাত হবে আমার কর্তব্য কি এবং যজ্ঞভাবনায় কর্ম করা শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু তখনও আবার ভালমন্দের বিচার আসে। কেননা যজ্ঞভাবনা তাঁরই উদ্দেশ্যে, সেটা শুধু নিজের জন্যও নয় আবার শুধু পরের জন্যও নয়। তিনিই আমার যজ্ঞেশ্বর প্রভু কর্মাধ্যক্ষ। তিনি বৃহৎচৈতন্য, আর আমার

এই অবস্থায় সমত্বের ভাব রেখে চলতে পারলে এক উদাসীন ভাব দেখা দেবে। প্রথমে সেটা তটস্থ ভাব থাকে, কিন্তু সেই তটস্থ ভাবের পরিপাকে দিব্য উদাসীন দ্রষ্টার ভাবে (Supramental Indifference) চেতনায় প্রতিষ্ঠা হয়।

সহিষ্ণুতার প্রসঙ্গে গ্রীকদেশের স্তোয়িক দর্শনের (Stoic) সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তে এক্ষেত্রে "ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্য" পরিত্যাগ করার শিক্ষা লাভ করা যায়। ভাগ্য বা অদৃষ্ট জীবনে যে আঘাতই নিয়ে আসুক, যে বিপর্যয় ঘটুক না কেন, সেটা বীরের মত বুক পেতে নিয়ে সহ্য করতে হবে। তা থেকে আসে তিতিক্ষা, যখন স্থির ও অটল থেকে দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা ও সুখে বিগতস্পৃহ হবার সাধনায় অবিক্ষুব্ধ যেন পাথরের মত এক সহ্যশক্তি লাভ হয়। গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে দৃঢ় সঙ্কল্প ও শক্তি নিয়ে সহ্য করার অভ্যাস করতে উপদেশ দিয়ে বলেছেন—"তিতিক্ষস্ব"। তিতিক্ষার শক্তিতে অভ্যস্ত হলে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে উপেক্ষার ভাব নিয়ে যেন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত কর্মের গতি হয়, কাউকে ভাল বা মন্দ কিছুই বলা যায় না। উপেক্ষা সহযোগে এ ভাবে চলতে পারলে অন্তরের অবর্ণ সমতায় এক রংছুট অবস্থা আসে, যাতে চিত্ত স্বচ্ছ হয়ে যায় এবং তা থেকে বীর্য লাভ হয়। সেই কারণে বৌদ্ধেরা এই সাধনাকে খুব বড় স্থান দিয়েছিলেন। এ থেকে আশেপাশের মানুষের প্রতিক্রিয়ায় ও সবরকম ঘটনায় পাথরের মত দৃঢ় এক বজ্রশক্তি স্বচ্ছ ও উজ্জ্বলভাবে আধারে আহিত হয়। যোগশাস্ত্রে এই অবস্থাকে বলা হয়েছে যতমান বৈরাগ্য। প্রযত্নসহকারে এই বৈরাগ্যের সাধনে স্থিতি লাভ করতে হলে কৃচ্ছ্রসাধনের এক পর্ব আসে। তাই একে চরম বলে সাধনায় গ্রহণ করলে সেটা আবার নৈষ্কর্ম্যে নিয়ে যেতে পারে। অন্তরে সচেতন থাকলে সর্বত্র এবং সর্বথা চেতনার অনিবাধ বৈপুল্যে আত্মদৃষ্টি খুলে যায়। সে আত্মার কেন্দ্র বিশ্বকেন্দ্রে স্থিত, তাই সমগ্র বিশ্বে সেই আত্মজ্যোতি ব্যাপ্ত।

"আত্মদীপো ভব" বলে এই ভূমির নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্তরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অধূমক জ্যোতির যে দীপটি প্রজ্বলিত, সেই দিকে চেতনার মোড় ফিরে যায়। সে অবস্থায় শান্তির প্রবাহ যেমন সচেতন হয়ে অনুভব করা যায়, তেমনি সেই শান্তির অচল অনড় দৃঢ় শান্ত ভিত্তিটি ধরা চাই। সে সম্বন্ধে সর্বদা হুঁশে থাকা চাই। এই কারণে আকাশভাবনা শ্রীঅরবিন্দযোগের বড় কথা। Silence, Void, Nothingness, এই ভাবগুলির অনুশীলন সুদৃঢ় না হলে যোগে রূপান্তর আসে না, ব্যামোহ সৃষ্ট হয়। আকাশের মত ভূমার একরসপ্রত্যয়ের বোধ এই পাথরের মত সুদৃঢ় আধারেই সম্ভব। ওই পাথরেই পরে প্রাণ জাগে। সূর্যের আলো পড়ে বজ্রমণিতে যেমন রংএর ফুলঝুরি দেখা দেয়, তেমনি সেই বজ্রনিথর আধারে নানারকম দিব্য ভাবের উদয় হয়। সত্তা থেকে এক কল্যাণের প্রবাহ আলোর ধারার মত বিচ্ছুরিত হতে থাকে। এর পর পর অবস্থাগুলি গীতায় বর্ণিত উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর, এই পাঁচ রকম ভাবে কর্মযোগীর সিদ্ধিতে ক্রমগুলি দেখা দেয়। উপদ্রষ্টা শূন্যবৎ শুধু দেখে যান, কিন্তু সেই সাক্ষীপুরুষের দৃষ্টির সম্মতি না পেলে প্রকৃতিতে কর্ম হবে কি করে? তাই অনুমন্তাও তিনি। সে সাক্ষীপুরুষ প্রকৃতিতে জড়িয়ে থাকেন না, তফাতে থেকে তাঁর দর্শন ও সম্মতি দিয়ে যান। তখন প্রকৃতির 'পরে যে নিয়ত কর্ম এসে পড়ছে, তা যদি স্বভাবের অনুকূল নাও হয় তবুও তা করে যাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে আকাশভাবনা ও আত্মতুষ্টি দুই-ই একসঙ্গে যোগের বনিয়াদরূপে পেতে হবে, আর তা হতেই যোগের উপায়-কৌশল খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি যা কর্ম দিলেন, তার উপকরণ নেই, যন্ত্রগুলি সব কাণা খোঁড়া; তবুও তাই নিয়েই যতটা সম্ভব স্বভাবের অনুকূল করে প্রাণ দিয়ে তাঁরই কর্ম করে যেতে হবে। এই রকম করে চলতে পারলে অন্তর থেকে শুভ প্রেরণা খুঁজে পাওয়া যাবে। এখানে প্রথম দিকে যে আকাশবৎ উদাসীনতা, সেটা দার্শনিকসুলভ জীবনদর্শন।

কি ভাবে হয়, তারও সাক্ষী হয়ে আছ। চৈতন্য কেন্দ্রে স্থির হয়ে আছে, আর কর্মের প্রবাহ আসা যাওয়া করছে। তখন অকর্মেও কর্ম আর কর্মে অকর্ম দর্শন করতে পারলে হয় অকর্তার কর্ম বা কৃৎস্নকর্মকৃৎ, আর তা হতেই সর্বকর্ম-বিশারদ হওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দ এই অবস্থা খুব ভাল করে দেখিয়ে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন! যেমন—কর্ম তুমি কর না, তবুও তোমাদের দিয়ে কর্ম করিয়ে নেওয়া হয়, বা কর্ম হয়ে যায়। শান্ত স্তব্ধ আকাশের বুকে যেমন বয়ে চলে প্রাণের মুক্ত ধারা, ঠিক তেমনি করেই সত্যসঙ্কল্প "একোঽহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়েয়" কর্মের মধ্যেই সম্পদ্যমান হয়ে চলে—সকলের জন্য নিজেকে দিয়ে কর্ম হয়ে বয়ে চলব, এই হল আত্মোৎসর্গের মূল ভাব। শ্রীঅরবিন্দ শক্তির ওই অক্ষীয়মাণ ধারা ও তার উৎস যে নীরবতা (Silence) ও শূন্যতা (Void) সেই ধ্যানচিত্র কতবার কত ভাবেই তাঁর বাণীতে তুলে ধরেছেন। এ থেকে সাধকের প্রতি উপদেশ হল, প্রকৃতিতে উৎসারিত কর্মস্রোত দেখে, সে ধারা থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়ে অকর্তা হয়ে অন্তরের কেন্দ্রস্থলে গভীরে তাঁরই সঙ্গে নিবিড় যোগে যুক্ত হও। অর্জুন নিজের বুদ্ধি বিচার অনুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে সদাচার ও সৎসঙ্কল্পের দোহাই দিয়ে পশ্চাৎপদ হতে চাইলেন, তিনি নৈষ্কর্ম্যের দিকেই ঝুঁকেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁর টুঁটি চেপে ধরে তার স্বভাবজ ক্ষাত্রধর্ম দেখিয়ে দিলেন যে যুদ্ধ তাকে করতেই হবে, প্রকৃতি তার আপন শক্তিতেই যুদ্ধকর্ম করিয়ে নেবে। কেননা এ কর্ম অবতারের আপন কর্ম—তাঁর কল্যাণ কর্ম। "ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে—আমার শক্তিতে মায়ার বিকার উৎপন্ন হলে, তা থেকে আসে ধর্মের গ্লানি; আর তখনই নতুন করে ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি নিজেই আবির্ভূত হই"। এই হল ভগবানের নিজের মুখের কথা। আমরাও জীবনে সেই কল্যাণকর্মকেই খুঁজে বেড়াই। আমরা যে শিবকে শিবতরকে চেয়ে চলেছি, এও সেই ভগবানেরই কর্ম। তা না হলে মানুষ বাঁচতে পারে না, সে প্রৈতি, সে তো কেবল এগিয়ে

লেগে যাই, সে তো কল্যাণকৃৎ-এরই ধর্ম। কিন্তু সেই সব কর্মের পথেই বিপরীত ভাবের অশুভ মন্দ পাপ এই সব বোধও তখন প্রতিযোগীরূপে দেখা দিতে থাকে। এই দ্বৈতবোধ মানুষেরই বুদ্ধিতে বিবেক-বিচারের ফল, পশুর মধ্যে এ দ্বৈতবোধ নেই। যদিও সাধারণ মানুষ জৈব কর্মে পশুরই উন্নততর এক জীবনযাপন করে এবং বেঁচে থাকার তাগিদেই মানুষের জীবনের কর্ম শুরু হয়, তা আমরা জানি। কিন্তু তাতেও ভালমন্দের বোধই তার কর্ম নিয়ন্ত্রিত করে। বেঁচে থাকার তাগিদটা মিটে গেলেই কোন এক আদর্শ বোধ মানুষকে জৈব প্রয়োজনের গণ্ডী কাটিয়ে সৎ কর্ম করাতে চায়। সেই আদর্শ বোধ যে একটা অনড় বস্তু নয়, তা নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করে শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, জীবনের পথে চলতে গিয়ে ঠেকে শিখতে হয় আদর্শ বোধ কি আর কিভাবে সে সম্বন্ধেও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হতে থাকে। ভগবানকে প্রেমময় মঙ্গলময় করুণাময় বলে আমরা যেন তাঁকে ওপরে তুলে রেখেছি। তাঁর জগতে তাঁর সৃষ্টিতে এত অশুভ পাপ দুঃখ এল কি করে—এই জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে না বলে তাঁরই কাছে আমাদের এই সমস্যার যেন জবাবদিহি চাই। কেননা দ্বৈতের জগতে এর সোজা কোন উত্তর মেলে না, বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যাও চলে না। এই দ্বৈতবোধের ওপারে চেতনাকে তুলে নিতে পারলে দেখা যায় যে অশুভকে একেবারে সরিয়ে দেওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। আবার ঐ অশুভ শক্তিকে অসুর শয়তান (evil) যে নামই দিই না কেন, তার সঙ্গে ভগবানের এক দ্বন্দ্বও দেখা যায়। তাহলে ভগবানের ভগবত্তা কি রকম হল? বেদান্ত তাঁকে বলেছেন "শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্।" কথাটা তাহলে দাঁড়ায় যে, পাপ আছে, কিন্তু পাপ তাঁকে বিদ্ধ করতে পারে না। তাহলে পাপেরও একটা স্থান রয়েছে, জগতের সৃষ্টির ব্যাপারে তাকেও একটা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে। তখন এই দ্বন্দ্ব নিয়ে তাঁর ইচ্ছা-শক্তি বা সত্যসঙ্কল্প কি ভাবে জগৎ পরিচালনায় কর্ম করছে, সেটা বুঝে দেখার কথা আসে। আমার ইচ্ছা দিয়ে

তাঁর ইচ্ছা বুঝতে যাই, তাহলেই গোলযোগে পড়তে হয়। কিন্তু তাঁর ঐ বৃহৎ ইচ্ছাশক্তির ধারা নৈর্ব্যক্তিক ভাবে দেখলে বোঝা যায়, দ্বৈত না থাকলে, আলোছায়ার সৃষ্টি না হলে জগদ্‌ব্যাপারই সম্ভবপর হয় না। জীবন তো শুধু যান্ত্রিক আবর্তন মাত্র নয়, তার পিছনে একটা বাস্তব ছন্দের ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়, তার একটা লক্ষ্যও আছে। শিল্পী যখন তার শিল্পকলায় আলো-ছায়ার খেলা বহু বিচিত্র ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে, তখনই সেটা সার্থক সুন্দর শিল্পসৃষ্টি হয়। শুধু আলো বা শুধু ছায়া কোন কারুশিল্প সার্থক করতে পারে না।

শ্রীঅরবিন্দ প্রকৃতির পরিণামী ধারা দেখিয়ে ওই দ্বৈতবোধকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অসৎ থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোয় ও মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে যে চলা, তারই এক মধ্যবর্তী অবস্থায় চেতনার এই মিশ্রিত ভাব, যেখানে আলো-ছায়া হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ এই রকম সব বিপরীতধর্মী দ্বন্দ্ববোধ দুদিকে চেতনাকে আকর্ষণ করতে চায়। প্রকৃতি-পরিণামের এই মধ্যবর্তী অবস্থায় যে দোলা, তার দুদিকেই অব্যক্ত, যেন দুই মেরু। যেদিকে অভিব্যক্তির লক্ষ্য, সেদিকে শুধুই আলো অমৃত সত্য। সেখানে কোন সংঘর্ষ নেই, তাকে আমরা বলে থাকি সুমেরু। সেখানে পুরুষ বা শুদ্ধ আত্মা, তিনি দ্বন্দ্বাতীত চিৎ-স্বরূপ। অপর দিকে প্রকৃতির অব্যক্ত দশায় হল কুমেরু ; সেখানে একেবারে নিরেট জড়, যেখানে এক অনড় অবস্থায় চৈতন্য মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে। সেখানেও দ্বন্দ্ববোধ নেই, সবটা যেন এলিয়ে ঝিমিয়ে রয়েছে। সেই জড়ের কুমেরু থেকেই প্রাণের ক্রিয়া শুরু হতে দেখা যায়, আর তারই মধ্যবর্তী ব্যক্ত অবস্থায় আমরা এক বিষমের দ্বন্দ্ব দেখতে পাই। কিন্তু প্রাণ একা ঐ বিষমকে সুষম (Cosmos) করে গড়ে তুলতে পারে না, যদি না তাতে মনের আলো পড়ে ছন্দ ও সুষমা গড়ে ওঠে। কিন্তু মনোজ্যোতিতে পৌঁছালে দেখা যাবে, সেখানেও এক শুদ্ধ উদাসীন ভাব।

পারে না। জড়ের রাজ্যে জীবজগতে ও মনোভূমিতে প্রাণশক্তিই চেষ্টা করে চলেছে সমগ্র প্রকৃতিকে ছন্দ দিয়ে সুর দিয়ে তন্ত্রিত করতে। কিন্তু সে সার্থক হয় তখনই, যখন সে প্রজ্ঞা-শাসিত হয়ে প্রজ্ঞাসহযোগে চলতে পারে। প্রাণের ঐ ঋতায়নী শক্তি একটা পরমাণুর ছাঁচের (structure) মধ্যেও আমরা দেখেছি। কিন্তু ঐ ছাঁচেও চৈতন্যের আলো এসে না পড়লে সেটি প্রাণবন্ত হয় না। রজোগুণের ক্রিয়া আধারের রাজ্যে সেই আলোর পিপাসাই ফুটিয়ে তোলে।

সূর্যোদয়ের লাল বিম্ব শুদ্ধ রজোগুণের প্রতীক। মধ্যরাত্রি (0-hour) থেকেই আলোর অভিযান শুরু হয়, যেখানে অন্ধকার সব চেয়ে গাঢ় হয়ে আসে। বেদে অশ্বিদ্বয়ের অভিযান ঐ মধ্যরাত্রি পেরিয়েই যে শুরু হয়, তার প্রথম দিকের অংশকে বলা হয় তমোভাগ অশ্বী আর শেষ রাতের অংশকে বলা হয় জ্যোতিভাগ অশ্বী, তখন রজোগুণের ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত প্রবল হয়েছে। তারপর উষার আবির্ভাবে সত্ত্বগুণের ক্রিয়ায় যে আলো জেগে উঠল, সেই আলোই হল বোধের শক্তি—তা মৃতকে প্রাণ দান করে। সেই শক্তি বরণীয় সবিতার ভর্গদ্যুতি, সেই শক্তিই সাবিত্রী শক্তি। তমোগুণে আধার গড়ে ওঠে, রজোগুণে সেই আধার হয় প্রাণচঞ্চল আর সত্ত্বগুণে তাতে চৈতন্যের আলো প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। মানুষকে যে বলা হয় thinking living body, তার ছাঁচ এইভাবে তৈরী হয়। উপনিষৎ পুরুষকে বলেছেন মনোময় প্রাণশরীর নেতা। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন প্রকৃতিতে মানুষের ছাঁচ সৃষ্টিতে তিনগুণের সমাহারে এক বিশেষ ক্রম-অভিব্যক্তি দেখা যায়। তার দেহে তমোগুণের ক্রিয়া প্রাণশক্তিতে রজোগুণের ও মনোজ্যোতিতে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া। মানুষের মধ্যেই আবার যাদের দেহের টান প্রবল, সেখানে সব কিছুই অত্যন্ত নিরেট—স্থূল। সংসারে পনের আনা লোকই সেই রকম টানে অভ্যস্ত, খাওয়া-পরা ও গতানুগতিক ঐ স্থূল জীবন ছাড়া আর যেন কিছুই তারা জানে না। মনের

ব্যবহারের উর্ধ্বে উঠে সমগ্র দৃষ্টি অধিগত করা চাই। সেখানে ক্ষুদ্র অহং-এর স্থান নেই। প্রকৃতির উর্ধ্বে যে আত্মা, সেই শুদ্ধ আত্মায় স্বাভাবে বৃহৎ হতে হবে। সেই চৈতন্যে প্রতিষ্ঠা হয় "মদাত্মা সর্বভূতাত্মা" এই বোধের পরিপাকে। তখনই প্রকৃত মুক্তি লাভ হয় ও সেই সঙ্গে তিনগুণের ক্রিয়াকে সংযমিত করা যায়।

আমদের মূল সমস্যা হল এই যে, মানবপ্রকৃতিতে তিনটি গুণই মিশে রয়েছে জড়াজড়ি করে। তাই আমরা প্রায়ই সমতা রক্ষা করে জীবনে চলতে পারি না। সদাচারের আদর্শ রক্ষা করতে গিয়ে পুণ্যকর্ম নিয়ে অযথা হৈ চৈ করে ফেলি। তাতে সত্ত্বগুণ রজোগুণের অধীন হয়ে পড়ে ও রাজসিক ভাব বেড়ে যায়। তখন শক্তির অপচয় ঘটতে শুরু করে, ভাব বিহ্বলতার এই এক মারাত্মক ত্রুটি। রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা মনে পড়ে :

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ।
দাও ভক্তি শান্তরস ;...ইত্যাদি।

সমিধ যদি আগুন হয়ে সবটাই না জ্বলতে পারে, তবে ধোঁয়া সৃষ্ট হয় ও আত্মহোমের উর্ধ্বমুখী শিখাও স্তিমিত ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সেই রকম সত্ত্বগুণ আশ্রয় করে চললেও সাধকের লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে রজোগুণ ও তমোগুণ সেই সত্ত্বগুণের অধীনে ক্রিয়া করতে পারে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্ব উর্জিত হওয়া চাই ; তখন রজোগুণ ও তমোগুণ তার বশে থাকবে ও আপন আপন শুদ্ধাবস্থা ফিরে পাবে। এ বিষয়ে সাধনায় করণীয় আচরণগুলি (চর্যা) সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান যেমন আছে, সিদ্ধ আচার্যগণ তাঁদের আচরণ ও উপদেশ

দ্বারা জিজ্ঞাসু সাধকদের চিরকাল পথ দেখিয়েও যাচ্ছেন। প্রাচীন উপনিষদে আহার-শুদ্ধি থেকে সত্ত্ব-শুদ্ধি ও তা থেকে ধ্রুবাস্মৃতি বজায় থাকে, এ নির্দেশ আমরা পেয়েছি। কিন্তু এ সত্ত্বশুদ্ধির ফলে যে প্রশান্তি আসে, তা কিছু তামসিক প্রকৃতির স্থৈর্য মাত্র নয়। যেন কোন বোধ নেই, এমন এক নিরেট অসাড়তাকে আমরা শান্তি বলে ভুল করে থাকি। আলো চাই, এবং তা জ্বলবে অধূমক জ্যোতি হয়ে। সাধারণ দৃষ্টান্ত দিয়েও আমরা বুঝে দেখতে পারি যে, যখন আলো জ্বালানো হয়, তা থেকে কালি (carbon) উৎপন্ন হয়; কিন্তু আলোকে উজ্জ্বল রাখতে হলে তাতে কাঁচের আবরণ দিয়ে ঐ কালিকেও পুড়িয়ে আলো করে দিতে হয়, এই নিয়ম। তেমনি শুদ্ধসত্ত্ব রজস্তমোলেশশূন্য হলেও তা নিম্ন অপরা প্রকৃতির কবলে থাকলে বিশুদ্ধ থাকতে পারে না। তাকে বিজ্ঞানভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, তা হবে বিশুদ্ধ সত্ত্ব। তার আলোতে রজঃ ও তমোগুণের বিক্ষেপ ও মূঢ়তা পরাবর্তিত হয়ে বীর্য শক্তি শান্তি ও স্থৈর্য আধারে স্থায়ী আসন লাভ করবে।

প্রাচীন যোগশাস্ত্রে ঐ সব শুদ্ধির প্রক্রিয়া ও করণ নিয়ে অনেক সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে। কারণ তাতে প্রবর্ত দশায় অনেক ভুল করা ও ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকে। রজোগুণ ও তমোগুণের ঊর্ধ্বে ওঠার অর্থ এ নয়, যে এক নিরেট নির্বোধ অবস্থায় চেতনা চাপা পড়ে যাবে; তা হলে তাকে কোন মতেই যোগ-চেতনা বলা যায় না। চিত্তের মধ্যে এক অনুস্মৃতির দহন অনুক্ষণ চিত্তকে সজাগ ও সমনস্ক করে রাখে, আর তারই মধ্যে জ্বলছে চিত্ত-দীপের অধূমক জ্যোতি—এই ঊর্ধ্বমুখী স্মৃতির অনুগমন করে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত সেই জ্যোতি দর্শন করতে হবে। তার বদলে শূন্য বা ফাঁকা চিত্তাধারে নিরেট নির্বোধ ভাব চেপে বসে চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করতে না পারে এজন্য বিশেষ যত্ন নিতে হবে। সেই ভয়ঙ্কর প্রমাদ আসে তমোগুণ থেকে। গীতায় তিন গুণের প্রসঙ্গে তিন গুণের ক্রিয়াকে সাজিয়ে দেখানো হয়েছে।

অবস্থায় গুণক্ষোভে বিচলিত না হবার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কর্ম করতে আবার নেমে আসতে যদি গুণক্ষোভে ভয় পাই, তাহলে পূর্ণযোগ হল না। সেই রামকৃষ্ণদেবের কথা যে "নি"তে গলার স্বর চড়িয়ে তো থেকে যাওয়া যায় না। "সা"তে নেমে আসতে হয়। বিবেকানন্দ নির্বীজ সমাধিতে মগ্ন হয়ে থেকে যেতে চাইলে রামকৃষ্ণদেব তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন, বলেন "তুই তো বড় হীনবুদ্ধি। সমাধির পারে যা। সমাধি তো তুচ্ছ কথা।" পরে তিনি বলেছিলেন যে এই চাবি বন্ধ করে কাছে রেখে দিলেন, লোকশিক্ষার কাজ শেষ হলে তবে সেই চাবি খুলে পাকা ফলটি দেবেন।

তাহলে সংসারে থেকে কর্ম করাটাই ক্ষতির কারণ হবে, তা বলা যায় না। গীতা বলেছেন কর্ম বন্ধন হয়ে দাঁড়ায়, যদি সেটা যজ্ঞ রূপে অনুষ্ঠিত না হয়। সংসারে থাকলে ঝামেলা আছেই; সেই যে বলা হয় যে কাজলের ঘরে কালি তো লাগবেই। তা লাগুক, তবুও সেখানে থেকেই ঐ সব ঝুট ঝামেলাকে যুদ্ধং দেহিং বলে রুখে দাঁড়াতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ এই বীরভাবের ওপর জোর দিয়েছেন। যে শুদ্ধ ভাব নিয়ে ঊর্ধ্বে চেতনায় উজান গতি হল, সেই শুদ্ধ ভাব নীচের এই সাধারণ চেতনায় নামিয়ে আনতে হবে। ঠাকুর ঘরে সদানন্দে বিভোর হয়ে থেকে যেই নীচে নামলাম অমনি বিক্ষুব্ধ হলাম— এই রকম হতে থাকলে পূর্ণযোগ হল না। আলোর পর আঁধার তো আসবেই, তাই তখন চাই ধৈর্য। অসীম ধৈর্য নিয়ে থাকলে আঁধারের শক্তি পরাভূত হবে, ঠাকুর ঘরের শান্তি এই এখানেও বজায় থাকবে এই হল সর্বক্ষণের সাধনা। চব্বিশ ঘণ্টায় নিয়ত কর্ম কিছুটা করি, আবার কিছু কর্ম যেন ঘাড়ে চেপে পড়ে, সে সবই কর্ম; সব রকম কর্মের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে যোগ চাই, তাঁকে সবের মধ্যে পেতে হবে। রামকৃষ্ণদেব বলতেন যে সংসারে থেকে তাঁকে ডাকার অর্থ হল বিশমন পাথর সরিয়ে তাঁকে দেখার মত শ্রমসাধ্য। তিনি যে আমার সব কর্মের অধ্যক্ষ, সব ছাপিয়ে তিনি সবের ওপরে; তবু সমস্ত জগতের

কর্মবিলাসের স্রোত তো তাঁরই নির্দেশে বশীভূত হয়ে চলছে। এই কর্মাধ্যক্ষকে সাক্ষী চেতা কেবল নির্গুণ রূপে দেখে মনে হয় বড় উঁচু সুরে বাঁধা এই ভাব কি শুধুই সিদ্ধের জীবন-বেদ? কিন্তু সাধকের অনুভূতি এই পথ ধরেই চলে। কর্মযোগের যজ্ঞেশ্বর প্রভু যিনি, বিশ্বোত্তীর্ণ বিশ্বগত হয়েও তিনি ব্যক্তিগত; আমার জীবন-যজ্ঞের প্রভু। গীতার ভাষায় ক্ষরপুরুষ ও অক্ষরপুরুষ নিয়ে ও তাদের ছাপিয়ে রয়েছেন যে পুরুষোত্তম, সেই উত্তম পুরুষকে জীবনের প্রভু রূপে পাওয়া চাই। তখন ব্যষ্টি বিশ্ব ও লোকোত্তর এই তিন ভাবেই দৃষ্টি খুলে যাবে। শ্রীঅরবিন্দ লোকোত্তর প্রতিষ্ঠায়—গীতায় যেখানে নৈষ্কর্মের সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে, সেখানে চেতনাকে উর্ধ্বে তুলে নিয়ে রেখে দেখিয়েছেন যে সেখানেও কর্ম ত্যাগ করা নয়। কর্ম না করে সেখানে প্রতিষ্ঠা হয় না, আমরা এ বিষয়ে ভুল বুঝে থাকি। কর্মের প্রেরয়িতা তিনি, কর্মের পিছনে তাঁকে দেখতে হয়। প্রকৃতির বশে অবশের মত যে কর্ম হতে দেখা যায়, সে সব কর্মের উর্ধ্বে তিনি। তার অর্থ এ নয় যে কর্মের স্পন্দ সেখানে নেই। প্রকৃতিই সকল কর্মের কারয়িত্রী আর পুরুষ শান্ত নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা এই উপলব্ধিই নৈষ্কর্ম্য। কিন্তু সে উপলব্ধির কর্ম ত্যাগ করে তবে পাওয়া যায় এই ধারণা ভ্রান্ত। এরপর বিশ্বময় বিশ্বগতভাবে যে তাঁর বিসৃষ্টি তাঁর উল্লাস উপলব্ধিতে ধরা পড়ে, সে তো ঐ নৈষ্কর্ম্যেরই কর্ম। পুরুষের শক্তিতেই প্রকৃতির কর্ম, পুরুষের দৃষ্টির বাহিরে প্রকৃতির কোন অস্তিত্বই থাকতে পারে না। বিগ্রহে পুরুষকে দেখলে বোঝা যায় যে জড়ের আধারে প্রাণচৈতন্য নিয়ে তাঁর এক অপরূপ বিগ্রহ মানুষ দেহধারী মানুষের মতই। তাঁর ঐ মানুষ দেহধারী বিগ্রহকে সাক্ষিচৈতন্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে কর্ম করতে শিখতে হবে। জীবনের কর্মে এই ভাব আরোপ করতে পারলে কর্মযোগের পথ খোলে। জগদতীত সত্তায় থেকে তিনি যেন কিছুই নিজ হাতে করছেন না অথচ সব কর্মই হয়ে চলেছে। তিনি চাতুর্বর্ণ্যের স্রষ্টা তবুও তিনি অকর্তা। 'আমার

উদ্দীপ্ত কর্মে অন্তরে প্রশান্তি বজায় থাকবে। গুণাতীত উর্ধ্বে অবস্থিত বলে তা যেমন সৎ বস্তু, তেমনি তারই মধ্যে সেই প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে, যাকে আমরা বলেছি দিব্যসঙ্কল্প বা সত্যসঙ্কল্প। ঐ ইচ্ছাশক্তির প্রভু তিনি, তাঁকে সেই ভাবে ব্যক্তি-রূপে যখন দেখতে ও বুঝতে পারব, তখন আমার মধ্যে তাঁকে পাব বা আত্মায় প্রতিষ্ঠা লাভ করব। কিন্তু সেই অতিষ্ঠায় বা লোকোত্তর চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা ও এক বিশ্বব্যাপী সমগ্র চৈতন্যে ব্যপ্তিরূপে স্থিত হতে না পারলে তাঁর ব্যক্ত মানুষী তনুকে বোধে আনা সম্ভব হয় না। ভগবান বলেছেন "অবজানন্তি মাং মূঢ়া···· সর্বভূতের ঈশ্বরস্বরূপ আমার পরম সত্তা না জেনে মনুষ্য দেহে অবস্থিত আমাকে অবজ্ঞা করে।" তাঁর গুণাতীত (transcendent) বিশ্বাত্মক ও বিগ্রহবান তিনটি ভাবই ভাল করে বুঝতে হবে। এর মধ্যে একটিকে ধরে থেকে অপর দুটি ভাব না ধরতে পারলে ভুল হয়ে যায়। তিনটি ভাবকে এক সঙ্গে জীবনগত করে ধরে না চলতে পারাই যোগের পথে মূঢ়তা।

আমার মধ্যে তার ভিত্তি কোথায় কি ভাবে? আমার দেহ রয়েছে, রয়েছে তাকে কেন্দ্র করে আমার সংসার; তাতে আমি রস পাই, তাই আসক্তিতে আমার চিত্ত বাঁধা পড়ে আছে। বলতে পারি 'আমি' যতটা সত্য, আমার বাসনা কামনা এ সবই আমার কাছে নিরেট সত্য। কিন্তু সেখানে তো আমি একা নই, শুধু আমাকে নিয়ে তো আমার সব কিছু চলে না। বাসনা কামনা নিয়ে সকলের সঙ্গে তো আমি মিলতে পারি না। তখন বিশ্বগত ভাবে এই বাসনা কামনার রাজ্যেও নিজের ব্যক্তিগত বাসনা কামনার সঙ্কীর্ণতা ছেঁটেফেলতে হয়। জীবনে অপরের সঙ্গে নিজের ইচ্ছা সামাল দিয়ে না চলতে পারাটা নাবালকত্ব। সাবালকত্ব হল নিজেকে কেন্দ্র করে নিয়ে প্রথমে একটা পরিবার বৃত্ত হয়, তা থেকে হয় সমাজ, তারপর তা থেকে সারা বিশ্বে সবার মধ্যেই নিজের পরিবার ও সমাজবোধের ভাব জেগে উঠে সে বৃত্তের পরিধি ক্রমেই বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে ওঠে। সে বৃত্তের কেন্দ্রে এই

ধরে রাখার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। কিন্তু তাই বলে তামসিক সমর্পণের জড়ত্বকে প্রশান্তি বলে ভুল না করি, সেটা দেখতে হবে। সেই রামকৃষ্ণদেবের কথা মনে পড়ে যে, ডাকাত পড়া ভক্তি চাই। তামসিক সমর্পণ হল ত্যাদড়্যাদে চিড়ের ফলারের মত, সেটা পরিহার করতে হবে। আবার শক্তিরও ভাণ্ডার লুটে নেব, এরকম রাজসিক উগ্রতা ও অস্থিরতা ছাড়তে হবে। তাঁরই স্বরূপে নিজের সব কিছু দিয়ে দিতে হবে তো। সেই ঐকান্তিক আত্মসমর্পণে তাঁর লোকোত্তর গুণাতীত পরম সত্তাটিকে জোর দিয়ে ধরতে হবে। তিনি যে সব ছাপিয়ে ঐ আকাশ হয়ে সবের উর্ধ্বে থেকে আমার দিকে চেয়ে আছেন, তিনি যে আমাকে বরণ করেছেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ! তিনিই যে আমার স্বামী, আমার গোত্রান্তর ঘটিয়েছেন, আমার সেই অভিমান। এবার আমার রূপান্তর ঘটাও, একেবারে তোমারই করে নাও; আমার সব কিছু আমি সঁপে দিই তোমাকে। কিন্তু তুমি কে, সেখানে আমার ও তোমার মধ্যে কোন আবরণ ধূমায়িত হয়ে থাকলে তো চলে না। বিশ্বাতীত বিশ্বব্যাপ্ত হয়েও তুমি আমার একান্ত আপন জন। তুমি আমাকে স্বীকার করেছ বলেই না আমার চিত্তে শ্রদ্ধা জেগেছে, তোমার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছি। এখন যা করবার তুমিই করো। তিনি তখন কি করবেন? যা আমার সত্যস্বভাবের অনুকূল, সেই স্বধর্মের পথ ধরেই তিনি চালিয়ে নেবেন।

কিন্তু আমাদের গোলমাল হয় যখন আমরা স্বকর্ম নিয়ে পরের মুখে ঝাল খেতে যাই। সাধুসঙ্গ করতে গিয়ে জ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে কর্ম ভুলে গেলাম, আবার ভক্তিবাদীর প্রভাবে হয়তো স্বকর্ম ছেঁটে ফেলে অযথা হৈ চৈ করে মত্ত হয়ে উঠি; তাতে সব মাটি হয়ে যায়। গীতা তাই সাবধান করেছেন যে, স্বধর্ম যখন পেয়েছ সেটাকে ধরে থাক, পরধর্মে লোভ করতে যেও না; সেটা হবে ভয়াবহ। সাধারণত অধ্যাত্মজীবনে রসবর্জনের পথ ধরতে গিয়ে এই দ্বন্দ্বেরই মধ্যে পড়তে হয়। চারিদিকে দেখি রসের ধারাই চলেছে, তবুও সেখানে রস

তাঁকে অর্ধেক পাওয়া গেল, পুরোটা যেন আর হয়ে উঠলো না। রামকৃষ্ণদেব বলতেন যে কুমোর কাঁচা হাঁড়ি পাকা হাঁড়ি সব এক সঙ্গে রোদে মেলে দেয়। সেখানে গরু এসে মাড়িয়ে দিলে কাঁচা হাঁড়ি কতগুলি ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু পাকা হাঁড়ি আর ভাঙে না। এই যে পরাভব—এ জীবনের সকল সিদ্ধ হল না, সেটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেয়ানা হলে বলতে পারব, না হক, এও তুমি। এই পরাভব গ্রহণ করে তোমাকেই জয় দিয়ে যাব। সিদ্ধি হল না, কাঁচা হাঁড়ি হয়ে যদি ভেঙেও যাই, হাঁড়িকার কুমোর তো তুমিই! "মরণরূপে আসিলে প্রভু, চরণ ধরি মরিব হে!" তোমাতেই আছি, ফিরব তোমাতেই। এই হল বীর্যের পরিচয়, এ বড় গভীর প্রত্যয়ের কথা। এর মূলে হল শ্রদ্ধা, সেটা থাকলে আমার দাহ ক্ষতি পাপ স্খলন সব কিছু নিয়েও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারব।

"জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি! জয় তোমারি করুণা।
জয় তব ভীষণ সকল কলুষনাশন রুদ্রতা।...."

এ আত্মসমর্পণ কিন্তু গুণাতীত পুরুষের কাছে নয়, কেননা গুণসাম্যের সে অবস্থায় তিনি কি আর সমর্পণের ধার ধারেন? তাঁর মহাশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, এ সমর্পণ প্রেমের ভক্তির ও শক্তির সমর্পণ। আত্মপ্রতিষ্ঠা হল পুরুষেরই রূপ, আর তিনি যে জননী, সেই চৈতন্য এবং মহাশক্তির যুগনদ্ধতা হতেই জগৎ বা জীবের জীবন। প্রত্যেকটি জগৎ বা জীবের পিছনে রয়েছেন ঐ মহাশক্তি। সবাইকে আবিষ্ট করে রয়েছে অন্তর্যামী পরম চৈতন্যের ঈশনা। তাই 'ভুবনেশ্বরী মহাশক্তিই আমাদের জীবনযজ্ঞে সর্বকর্মের ঈশানী মা।

তাহলে পেলাম যে কর্মে আত্মসমর্পণের ভাব নিয়ে আমাদের কর্মযোগ পথ চলা শুরু হয়। তারপর আমি করছি এই কর্তার ভাব ছেড়ে কর্ম করতে হবে। তখন হয় যন্ত্র হয়ে বা নিমিত্ত হয়ে কর্ম করা। গীতায় শ্রীভগবান

১৯

দিব্যকর্ম

কর্মযোগের শেষের দিকের আলোচনায় এবার আমরা এসে পড়েছি দিব্যকর্মের প্রসঙ্গে। Supramental work সম্বন্ধে যে অধ্যায় শ্রীঅরবিন্দ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, তা অসমাপ্ত রয়ে গেছে। দিব্য জন্ম লাভের পর যে দিব্যকর্ম, সেই প্রসাদের (Grace) অবতরণে ঐ সিদ্ধকর্ম সম্ভাবিত হবে। কিন্তু সে তো সাধ্য নয় সিদ্ধ, তাই তা ঠিক আমাদের আলোচনায় ধরা পড়ে না। গীতায় দিব্য কর্মের উল্লেখ থাকলেও সে সম্বন্ধে আলোচনা বা নির্দেশ তত স্পষ্ট নয়।

সমস্ত কর্মের কর্মাধ্যক্ষ তিনিই, তাঁর নির্দিষ্ট কর্ম এবং তাঁরই সম্পাদিত কর্মই দিব্যকর্ম। আবার ঐ দিব্য কর্মই তাঁর ইচ্ছামত আমার ভিতর দিয়ে যে ভাবে উৎসারিত হবে, আমাকে দিয়ে যে সুরটি তিনি বাজিয়ে তাঁর সঙ্গীতে পূর্ণতা আনবেন, দিব্য সুরলোকের সেই বিশেষ ধ্বনিটি আমাকে সেধে নিতে হবে। সেটা ধরতে পারলে তবেই আমার কর্মযোগ তাঁর দিব্য কর্মযোগ হয়ে উঠবে।

গীতায় কর্মযোগের পর পর কয়েকটি স্তর দেখানো হয়েছে, তা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। ভগবান নিজে সেখানে নৈষ্কর্ম্যের বিরোধী হয়ে বলেছেন "ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে"। আবার কর্মে সর্বারম্ভপরিত্যাগী ভক্ত যে তাঁর প্রিয়, তাও তিনি অন্যত্র বলেছেন। বিবিক্ত পুরুষ দ্রষ্টা আর প্রকৃতিই কর্মকর্ত্রী, এই ভাবে পুরুষই নৈষ্কর্ম্যের আধার। কি রকম? না নিজে থেকে কোন কর্ম ঘটিয়ে তোলা হচ্ছে না, অথচ কর্ম করা হয়ে যাচ্ছে, এই হল ভাব—অকর্তার ভাব। তাই বলে অকর্মের দিকে যাতে ঝোঁক না পড়ে, অর্জুনকে সে ভাবে কর্মের নির্দেশ দিতে গিয়ে কর্মের বিশ্লেষণ করেছেন

আদর্শ মানব সমাজের সব স্তরেই বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এতে মনস্বীর জীবনধারণ অত্যন্ত সরল ও সহজ হয়ে নিশ্চিন্ত হবে (plain living and high thinking)—এই নীতি এদেশের মনে বেশ দৃঢ়ভাবে গেঁথে বসেছিল। পাশ্চাত্য জীবনধারণের কর্ম কোলাহল আমাদের এই বহুকালের নিশ্চিন্ত জীবনে যে ঝড় তুলেছে, তাতে রবীন্দ্রনাথও একদা বলেছিলেন কর্মব্যস্ততায় কর্মক্ষেত্রে গলরজ্জুবদ্ধ হয়ে মরার কথা (to die in harness)। অতদূর পর্যন্ত সর্বথা সত্য না হলেও সারাজীবন ধরে ত্যাগের তপস্যা এদেশে উচ্চতর জীবনে যে আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল পাশ্চাত্ত্যের বিপরীতমুখী প্রাণচঞ্চল বৃত্তির পক্ষে তা হজম করা সহজ ছিল না। ওদেশের মনীষীরা এখন কেউ কেউ বুঝতে আরম্ভ করেছেন ম্যাক্সমূলারের সেই কথাটির অর্থ যে কেমন করে মৃত্যুকে জয় করা যায়, ভারতবর্ষ আমাদের তা শেখাতে পারে। সারা জীবন ধরে যে মৃত্যুর প্রস্তুতি, শেষ ধরেই যে জীবনের শুরু তাকে ধরা—এতে ত্যাগের মহিমা উজ্জ্বল হয়ে ভোগের সমারোহকে ম্লান করে দিয়েছিল। এ থেকে যে শিক্ষা ব্যাপ্ত হয়েছিল, তাতে ধর্মের শাসনে নিজেকে রেখে প্রাণশক্তিকে একটা খাত কেটে বহাতে হবে। তার জন্য বিধিনিষেধের এক বন্ধনে অভ্যস্ত হওয়ার মূলে ছিল সংযমের সাধনা। অভাববোধকে কমিয়ে এনে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি লাভ করার প্রচেষ্টায় ত্যাগের শিক্ষা হয়। আর পাশ্চত্ত্য সমাজে ঠিক এর বিপরীত ভাবে অভাববোধ বাড়িয়ে তুলে সমাজ জীবনে নিত্য নতুনের চাহিদায় মানুষের লোভের প্রবৃত্তি তার সদ্‌বৃত্তিগুলিকে যেন গ্রাস করতে বসেছে; এই অশান্তির ঝড়ে সমগ্র ভাবে জাতির জীবনে সর্বত্র অভাব বেড়েই চলেছে। শান্তিও নেই, স্বস্তিও নেই। এ দেশের নাগরিক জীবনে এই ঢেউ প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছে—ওদেশে জীবনের মানে অভাববোধ এনে তাকে উচ্চতর মানে তোলাই আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উনিশ শতকে এই লোকসংগ্রহের কর্ম ওদেশে মানবহিতবাদ বা

পরোপকারবাদের বোধে বুদ্ধিমান মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। মিল ও বেন্থামের প্রবর্তিত নীতি তখন এদেশের শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বঙ্কিমচন্দ্র গীতার ব্যাখ্যায় ঐ লোকসংগ্রহের কর্মকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে যে দেখিয়েছেন, তাতে ঐ মিল ও বেন্থামের প্রবর্তিত নীতির প্রচার দেখতে পাওয়া যায়। সকলের কল্যাণ করার জন্য কর্ম করাই কর্মযোগ। লোকমান্য তিলক তাঁর গীতার ব্যাখ্যায় কর্মযোগকে উচ্চে তুলে ধরেছেন—যোগ সর্বভূতহিতে রত এই দৃষ্টি প্রধান করে। প্রাচীন হিন্দু সমাজে পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থায় ঐ সর্বভূতের হিতের প্রতি উদার দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু মাত্র মানুষ কেন, "মদাত্মা সর্বভূতাত্মা" হলে বিশ্বের কোন কিছুই তো বাদ দেবার উপায় নেই। আত্মার সম্বন্ধ হলে জগৎ-সংসারে সকলের কথাই না ভেবে তো পারি না। কিন্তু তখনকার সামাজিক ব্যবস্থায় এ যুগের থেকে সমাজের গণ্ডীটা অনেক ছোট ছিল মনে হয়। মানুষের নিজস্ব ক্ষুদ্র গণ্ডী বাড়িয়ে বহুকে নিয়ে সমাজ তৈরী হয়। সে সমাজ মানুষের হিতার্থেই গঠিত। কিন্তু এখন মনুষ্য সমাজ বলতে সারা পৃথিবীতে সে সমাজ ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। স্বদেশ ও সমাজ এ সবের হিত করতে গিয়ে সেই হিতকে কোথায় টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যে মানুষের বুদ্ধি দিয়ে সমাজকে সামলানো যাচ্ছে না। সামাজিক বা সমষ্টির মধ্যে একটা মনস্তত্ত্বমূলক রীতিও গড়ে ওঠে। তাতে যার যা পরিবেশ তার প্রভাব তার মধ্যে কাজ করে, হঠাৎ তাকে বদলে দিলে সেটা সামলানো গণ্ডীবদ্ধ সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

স্ত্রী পুত্র পরিবার ও তা থেকে দশের ও দেশের কাজ এ সবই অযোগী চিত্তের ব্যাভিচারে পর্যবসিত হতে পারে। জগৎহিতবাদে তা থেকে পৌছানো লক্ষ্য থাকলেও অযোগী চিত্তের অনেক ফাঁকি দিয়ে তাকে অনেক সময় ভরতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ তা থেকে সাবধান করার জন্য সেদিকটা দেখিয়ে দিয়ে বলেছেন যে জীবনধারণ কর্ম থেকে লোকসংগ্রহ কর্ম পর্যন্ত এই ক্ষুদ্র অহং

পারলে নিমিত্ত কর্ম ও অকর্তার কর্ম কেমন করে দিব্য কর্মও হয়ে ওঠে, তা বুঝতে পারা যাবে।

তাহলে কর্মের লক্ষ্য কি হবে? ধর্মের কর্মকে আমরা তিন ভাবে দেখেছি কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম। তিনটিকে এক সঙ্গে নিয়েই যোগে কর্ম করতে হবে। ভাল করে চিনে নিয়ে বুঝে নিয়ে বিকর্মকে পরিহার করে অকর্মকে দেখতে হবে ও কর্ম করতে হবে। তাহলে অকর্ম বিকর্ম ও কর্ম তিন নিয়েই হবে নিমিত্ত কর্ম। এ ভাব আমাদের দেশে খুব প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে যে যজ্ঞার্থে কর্ম বা উৎসর্গের ভাবনা নিয়ে কর্ম করলে বন্ধন বা আসক্তি হবে না। আর তা না হলে কর্ম বন্ধনের কারণ হয়—"যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ"। তাই সবচেয়ে বড় কথা হল "মৎকর্মপরমো ভব"। শ্রীঅরবিন্দ বলেন সেই "মৎ কর্ম" থেকে বিচ্যুতিই বিকর্ম। তখন কোন স্বার্থে বা মৎলবে কাজ হয়, সে সবই বিকর্ম। যা হতে সর্ব ভূতের উৎপত্তি এবং যা দিয়ে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেই তাঁর কর্মই হল মানুষের স্বভাবজ কর্ম এবং সেই স্বভাবজ কর্মে সিদ্ধি লাভ করতে হবে। আবার সেই স্বভাবজ কর্মেই হবে তাঁর অর্চনা। এ সবই গীতার অনুশাসনে আমরা পেয়েছি। কার্লাইল (Carlyle) এই ভাবের কথা বলেছেন Work is worship। কিন্তু শুধু কর্ম করলেই অর্চনা হল না, জ্ঞানসহকারে কর্ম করা চাই। কর্ম সকলের উৎপত্তি যে একই ভূতভাবন উৎস হতে, সেই উৎস সম্বন্ধে সর্বক্ষণ সচেতন থাকতে হবে। সর্বব্যাপী ঐ পরম সত্তাই পরম শিব আর উৎস বা প্রবৃত্তির মূলে পরম শিবেরই স্বীয়া শক্তি—এই সমগ্র বোধে কর্ম চলতে থাকলে কর্মযোগে সিদ্ধি লাভ হবে। শিব-শক্তিকে এক সঙ্গে নিয়ে চলতে না পারলেই কর্ম হয়ে যাবে বিকর্ম। আর ঐ সামরস্য নিয়ে কর্মযোগ শুরু করলে মানব সেবা, জগৎহিতবাদ ইত্যাদি ছোট আদর্শগুলি তার মধ্যে বসানো যায়। কিন্তু সেসব কর্মে মোহগ্রস্ত হয়ে আটকে যেতে না হয়, তাতে সাবধান হতে হবে। দিব্যকর্ম পর্যন্ত আমাদের

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে আমাদের দেশে কর্মে যে বিতৃষ্ণা দেখা যায় তা এসেছে বৌদ্ধদের এক যুগ থেকে। বেদেই পাওয়া যায় মস্করী সম্প্রদায়ের কথা, তাঁরা ছিলেন বেদের কর্মকাণ্ডের বিরোধী। "মা কুরু" থেকে মস্করী শব্দটি এসেছে। তা থেকে "কিং কুতেন" করে কি হবে? এই "কিং কুতেন" পালি ভাষায় কীকট হয়েছে। কীকট সম্প্রদায়ের নীতি হল একেবারেই কিছু না করা। তাদের মতে কর্ম মাত্রেই বন্ধন। কেননা কর্ম আসে বাসনা থেকে। বাসনা থেকেই জন্ম, জন্ম থেকেই দুঃখ। তন্‌হা বা তৃষ্ণার মূলই কেটে ফেলতে হবে যদি দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি চাই। বারবার জন্ম ও কর্মের আবর্তনে এই পৃথিবীতে আসাকে তাঁরা বলতেন ভব, আর এ থেকে নিরোধ হল অনাবৃত্তি—"....ন পুনরাবর্ততে"। যদি এই জন্ম হওয়াই নিরুদ্ধ করতে হয়, তাহলে কর্মের নিরোধ চাই ও তার মূলে বাসনাকেই নিরুদ্ধ করতে হবে। এই হল দুঃখবাদ থেকে উৎপন্ন নিবৃত্তির দর্শনের দৃষ্টি-ভঙ্গী। কিন্তু এ তো সবাই মানে না বা মানতে পারে না। কেননা জন্ম হলে কর্ম করে মানুষ কি শুধুই দুঃখ ভোগ করে? তা তো নয়, দুঃখের সঙ্গে সুখও আছে এবং আত্মার স্বভাব হল আনন্দ পাওয়া। সুখ ও দুঃখ সবের মধ্যে থেকে সে আনন্দকেই রস স্বরূপে পায়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন আত্মহত্যায় পর্যন্ত এক রস আছে বলেই সেটা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তার ভোক্তা এক গুপ্ত পথে (occult way) সেই রস পান করে থাকে। রোগের যন্ত্রণা ভোগও সেই রকম চৈত্যসত্তার (Psychic being) রোগ ভোগের আকাঙ্ক্ষা থেকেই আসে, তারই অভিজ্ঞতা (experience) সঞ্চয়ের জন্য। জগতের যা কিছু ভোগ, ব্যথা বেদনা হাসি কান্না জ্ঞান কর্ম প্রেম সবের মধ্যেই চৈত্যপুরুষ রস ভোগ করেন, সেজন্যই ভোগের ব্যবস্থা। বাউলের সেই গানটা আবার এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে—"যোগে প্রেম ভোগে প্রেম রোগে প্রেম ঝরে"। যেহেতু ব্রহ্মই সব হয়েছেন, তদতিরিক্ত কিছুই থাকতে পারে না। তিনি রসস্বরূপ হলে

বা কি রকম? এ যুগেও বেদান্ত কেশরী বিবেকানন্দের গর্জন শুনতে পাই—"মুক্তি চাইনে, সর্ব জীবের মুক্তি দে মা। মা তুই নেমে আয়।" এই সব দেখে শুনে বুঝি এই সেই পুরুষের প্রেম, পুরুষোত্তমের প্রেম-বীর্য। সে তো শুধু প্রেম-বিলাস আর পূজাগ্রহণ নয়। ধরার ধূলি সঙ্গে কাদা মাটি ক্লেদ মাখামাখি হয়েও মুক্তির পথ খনন করে চলা, সোমপাত্র গঠন করার জন্যে সূক্ষ্ম তন্তু বয়ন করে চলা—এই সব হল দিব্যজীবনের ভূমিকায় দিব্য কর্ম—যা শ্রীঅরবিন্দ সর্ব মানবের জন্য করে চলেছেন। Life Divine গ্রন্থে তিনি অসম্ভূতির দিকও দেখিয়েছেন। অসম্ভূতিতে গিয়ে কেউ কেউ আসতে চায় না বা আসেও না। সেই সবই তাঁর ইচ্ছায়। কিন্তু তাঁরই যে সম্ভূতি, তাকে তো অস্বীকার করা যাবে না। এক দিকে ঝুঁকে পড়লে সমগ্র দর্শন খণ্ড হয়ে যায়, কিন্তু সমগ্রে অভিভূত হয়ে খণ্ডকে দেখতে পারলে তার ব্যষ্টিত্বও বজায় থাকে, অখণ্ডের খণ্ড হয়ে সে শোভা পায়; সে "মৎকর্মপরম" হয়ে যায়।

২০

অতিমানস ও রূপান্তর

কর্মযোগ সম্বন্ধে প্রায় সব কথাই আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করলাম। গীতার আদর্শ নিয়ে কর্মযোগের কর্ম করা থেকে আরম্ভ করে দিব্যকর্ম পর্যন্ত আমাদের আলোচনার বিষয় ও লক্ষ্য ছিল। তা যেখানে শেষ পর্যন্ত পরিনিষ্ঠিত, সেই অতিমানসই দিব্যকর্মযোগের উৎস ও পরিণাম—এটা আমরা শ্রীঅরবিন্দের বাণী থেকেই জানতে ও বুঝতে পারলাম। অতিমানস কর্মকে কর্মযোগের গোড়া থেকেই আদর্শ ও লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হতে হবে এ কথা ঠিক, কিন্তু অতিমানসকে নিয়ে এক উদ্ভট কল্পনা করে গোড়াতেই তাকে কর্মে নামাতে চেষ্টা করলে, সেটা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে। সাধক দুরাগ্রহবশত যেন সেদিক দিয়ে চেষ্টা করতে গিয়ে বিপথে না পড়েন, সেদিকে শ্রীঅরবিন্দ বিশেষভাবে সাবধান করে দিয়েছেন। দিব্যকর্মের ভাব সহজ হলে তার পরিপাকে অতিমানস কর্ম স্বাধিত হতে পারবে, সেই দুর্লক্ষের অভিসারে শক্তিপাত হতে হতে অতিমানসের আবেশে এক দিব্য পরিমণ্ডল গঠিত হবে। তা বুঝতে ও ধরতে পারার সাধনায় একেবারে গোড়ার কথা হল সুসমঞ্জস হওয়া চাই। পূর্ণযোগ সর্বাঙ্গীণ যোগ, তার প্রতিটি অঙ্গই এক সুষম সমতায় বিধৃত থাকবে। কোন একটি অঙ্গকে অধিক পরিপুষ্ট করতে গিয়ে যোগের সর্ব অবয়বের পবিত্র তন্তুতে চাপ পড়ে বদ্ধ আবর্ত ঘৈরী হয়ে শক্তিপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই ঐকান্তিক আত্মসমর্পণের ভূমিকায় সাধনার প্রারম্ভেই "ব্যাপ্তিরূপেণ সংস্থিতা" ঈশ্বর-শক্তিতে আবিষ্ট হলে সাধকের স্বধর্ম ও স্বকর্ম সহজ হয়ে আসবে। বৃহতের সঙ্গে আত্মার ব্যাপ্তির বোধ যতই নিবিড় ও লঘু হয়ে আসবে, ঊর্ধ্ব লোকের শক্তিধারা ততই কার্যকরী ও সহজ হতে পারবে। সাধারণত মন দিয়েই আমরা সাধনা করতে যাই, আর তাতে রুচি ও সংস্কার

আমাদের মধ্যে যে ভক্ত, সেই তো চৈত্যপুরুষ। বৈষ্ণব বলেছেন ভক্তিই জীবের স্বভাব। শিব হয়েও ভক্তির ভাব নিয়ে জগৎ-সংসারে যে বিচরণ করা যায়, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি এ যুগের রামকৃষ্ণদেবের আচরণে। তাঁরই কথায় জেনেছি যে বাপ যদি ছেলের হাত ধরে থাকে, সে ছেলে পড়ে যেতে পারে না; কিন্তু ছেলে বাপের হাত ধরে চললে পড়ে যেতে পারে। এই যে তিনি এসে হাত ধরেছেন—এই ভাব নিয়ে কর্ম করাই হল "মৎকর্মপরমো ভব"। তোমারই কর্ম, এই ভাবের প্রতিষ্ঠা হয় ভক্তিতে ভালবাসায়। ভগবানের জন্য যে তৃষ্ণা, সে তো ভালবাসারই কাঙালপনা। "দরদী নৈলে প্রাণ বাঁচে না"—এই তীব্র অভাববোধই তো পাগল করে তোলে। আর তখনই নকল আমির মুখোস খসে যায়, চৈত্যপুরুষ তাঁর নিজের আসনে বসতে পারেন। ঐ নকল আমি তখন রূপান্তরিত হতে থাকে; তাকে বিসর্জন দিয়ে "আমি নিঃশেষে তোমার," ভালবাসায় এই রকম আত্মোৎসর্গের পরিণামে আসে চৈত্যরূপান্তর। জীবন তখন সরস ও মধুর হয়। অজানা দীর্ঘ পথ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই বালিকা বধূর সহজ নির্ভরতা নিয়ে সাধক তখন পথ চলে। ছোট মেয়ে, সে তার বরকে ভাল করে চেনে না। তার নিজের মত ছোট করেই সে তাকে দেখে; তাতে গুরুজনের চোখে তার বরের কাছে হয়তো কত অপরাধই করে বসে। কিন্তু তার বঁধু তার বর, সে তো হৃদয়ভরা প্রেম নিয়ে তারই জন্য অপেক্ষা করে আছে যে, তার বালিকা বধূর হৃদয়ে সেই প্রেম জাগবে কবে, তার হৃদয় দিয়ে বঁধুর হৃদয় চিনবে কত দিনে? কত রাতই বিফলে চলে যায়; কিন্তু যেদিন দুঃখ-রাতের ঝড় এসে সব কিছু টলিয়ে দেয়, তখন ঐ বালিকা বধূটি তার বরকেই সর্বশক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু তখনও সে জানে না যে তুমি তার জন্য নন্দনবনের মধুও সংগ্রহ করে রেখেছে। সেই রকম চৈত্যসত্তার স্ফুরণে চিদাবেশে সাধক তার পথ চলা শুরু করে। পথ অজানা, আলো আঁধারের মেঘ ও রৌদ্র পেরিয়ে যেতে তার হৃদয়ের সহজ ভালবাসাই হয়

কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রয়ী যোগের কথা বিশেষভাবে বলে তিনি আত্মসিদ্ধি-যোগের কথা সর্বশেষে বলেছেন। আসলে সহজ যোগ বলার অর্থ ই হল যে কর্ম জ্ঞান ভক্তি সবই পরিপূর্ণ আত্মসিদ্ধির উপায় এবং সেই কর্ম যোগকর্ম হলে সিদ্ধিও তখন সহজ হয়ে যায়। জ্ঞান ও ভক্তি যে কর্মের সহচরিত, তা নিয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করে ধরতে পেরেছি। কিন্তু তবুও সে সহজ সিদ্ধি লোকের পক্ষে সহজ হয় না। তাই মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি অনুযায়ী ত্রয়ীকে আলাদা করে করে অনুশীলন করে পূর্ণকে আমাদের বুঝতে হবে এবং সাধনায় তাদের মিলিয়ে নিতে হবে। কর্মযোগের পর এবার আমরা জ্ঞানযোগের আলোচনায় জ্ঞানের সম্যক পথটি ধরে চলার চেষ্টা করব।

* * *

যোগের প্রথম কথাই হল একাগ্রতা। একাগ্রতা নিয়ে অন্তর্মুখীন হয়ে পথ চলা শুরু করলে তবে যোগের পথ খুলে যেতে থাকে। না হলে বকের মাছ ধরায় বা শিকারী বিড়ালের উপায় কৌশল্যে যে একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে চিত্ত অন্তর্মুখীন হয় না। সমাধি হলেই যোগ হয় না। তাই প্রথমেই চিত্তবৃত্তিগুলি বহির্মুখ না থেকে অন্তর্মুখ হতে থাকে। যোগের শুরুতে এইভাবে জ্ঞানের ধারা উলটে যায়। আমি কে, আমাকে জানব কি করে, ইত্যাদি আত্মজিজ্ঞাসা নিয়ে যে ব্যাকুলতা বেড়ে চলে, তা বাড়তে বাড়তে আত্মাকে জানতে গিয়ে বিরাট ভূমাকে জানতে চায় ও সেই বৃহতের মধ্যে ডুবে যায়। তারপর জানতে হয় জগৎকে—দুনিয়ার দিকে আত্মার দৃষ্টি ফেরাতে হয়। গুণত্রয়ের ভিতর দিয়ে বিশ্বে যে কালের পরিক্রমা চলছে, তার ভিতরে অণুরও অণু আবার মহানেরও মহান্ দুভাবেই তাঁকে পেতে হবে, জানতে হবে, এই হল যোগ। তখন দেখি প্রকৃতিতেই তো যোগ চলেছে। তাই আত্মসচেতন হয়ে হুঁশে থাকা যোগের প্রাথমিক লক্ষণ। গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের ভূমিকা নিয়ে সব কিছু কর্মই করা যেতে পারে।

ত্রয়ীর অদ্বৈতানুভব। আত্মদীপ অন্তরে আর বাহিরে সর্বব্যাপী তুরীয় যে ব্রহ্মজ্যোতি, দু-ই এক। অদ্বৈতানুভূতির চরম কথা হল সর্বভূত—জীব জগৎ ব্রহ্ম সব একাকার। অনন্ত আলোর পরিধি, কিন্তু কেন্দ্র হল আত্মবিন্দু। তাই আত্মভাব থেকেই সব কিছু দেখা যায়, যেন ঘরভরা আলো আবার মানুষগুলিও আলো। ক্ষুদ্র অহংএর ক্ষুদ্রতা ভাঙে ভালবাসায়, কিন্তু সে ভালবাসা কোথায়? সেই ভালবাসায় বেঁচে থাকা, জীবন্ত প্রেমমূর্তি হয়ে বিশ্বব্যাপ্ত হওয়া, এই তো সার কথা। নির্বাণের পর যে শ্রীঅরবিন্দযোগের সত্যিকার আরম্ভ বলা হয়েছে, তার সূত্র হল ওই। বিজ্ঞান ভূমিতে অনন্তের পথে (Infinity) যাত্রা, অনন্তে প্রসারিত চিত্ত আর আলোর মতই সেই চেতনার ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তিদেবীই অতিমানসের কাজ শুরু করেন। বৈদিক ঋষির মন্ত্র "উরৌ দেবা অনিবাধে স্যাম" জীবনে জীবন্ত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বাইরের মাটিতেও 'মা'টি দেখা দেন। বস্তুজগৎ ভাবজগৎকে প্রকাশ করে দেয়। সেই ভাবের পরিপাকে ভাবই আবার জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। ভাবের জ্যোৎস্নালোকের আবেশে স্বপ্নময় এক অবস্থা প্রথমে আসে, তা কিন্তু সূর্যের আলোর মত অত স্বচ্ছ নয়। কিন্তু ঐ স্বপ্নালোকেই শক্তির পলিমাটি পড়ে পড়ে চিৎসূর্য উদিত হবেন। তখন হয় ভাবেরই জাগ্রত জগৎ। স্বপ্নাবস্থায় বা অন্তর্দশায় চিজ্জ্যোতির প্লাবন বিদ্যুতের মত ঝলকে ঝলকে আসে। একপ্রত্যয়সার, প্রভাসে ভিতরে অন্তর্জ্যোতি অন্তরে চিৎসূর্য ও জাগ্রত ভাবের ইন্দ্রিয় সব একরসে ঝলমলিয়ে ওঠে। তখন তো সৃষ্টিধারাই উলটে যায়। বোধির আলোর দিব্য আবেশে প্রাতিভ-সংবিৎ থেকে ইন্দ্রিয়-সংবিৎ ও তা থেকে জগৎ পরিবেশ সবই, যেন রূপ ধরে। এইভাবে বিষয় বিষয়ীর ভিতরে আগে সৃষ্ট হয়, তার বহির্মুখ প্রকাশ আত্মচৈতন্যেরই বিকিরণ। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দিয়ে দেখিয়ে দিলেন "ময়ৈব নিহতা পূর্বমেব"—আগে থেকেই তাঁর নিধন-যজ্ঞ হয়ে আছে। কালের নিয়মে যথাসময়ে তাকে এই বস্তু জগতে প্রতিফলিত কর, নিমিত্ত হয়ে

কর্ম কর। এই ভাবেই বুঝতে পারা যায় যে তখন শ্রবণ (শ্রবঃ) দর্শন (চক্ষু) ব্রহ্মসংস্পর্শে সবই দিব্য হয়ে যাবে। "মহেরণায় চক্ষসে" এই মন্ত্রে শ্রুতি বলছেন, এই চোখ দিয়েই সেই মহান্ বিপুল আনন্দকে দেখব, এই সমস্ত জলটাই দিব্য দেখতে পাচ্ছি। বাহিরের চেতনার এই অনিবাধ বৈপুল্য আত্মারই আত্মপ্রসারণ। এই রকম করে বিশ্বচৈতন্যে নিমজ্জিত হয়ে উজ্জ্বল রসে জারিত হয়ে ব্যক্তিচৈতন্য ভগবৎ-চৈতন্যকে আত্মসাৎ করে। সেই মহাপ্লাবনে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব শেষ পর্যন্ত একেবারে নিঃশেষিত হয়ে গলে যাবে। আর তখনই অতিমানসের মহা বিস্ফারণ সঙ্ঘটিত হবে। রূপান্তর যোগের কাজ তখনই সম্পূর্ণ হতে পারবে, তার পূর্বে নয়। অতিমানস কালশক্তিকে কি ভাবে নিয়মিত করে, সে সম্বন্ধেও শ্রীঅরবিন্দ শেষের দিকে সূত্র ধরিয়ে দেবেন। কালাতীত অধিষ্ঠানে মহাকাল ও ত্রিকাল সেখানে একাকার, কালের প্রবাহে সেই মহাবিন্দুক্ষণটি চেতনায় ধরতে শিখতে হবে। সেই মহান আবিষ্কারে চেতনার রূপান্তরে পূর্ণযোগের পরমা সিদ্ধি পর্যন্ত সম্ভাবিত হতে পারবে।